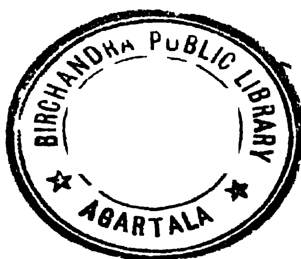
ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ



মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার),
কলিকাতা—১২

দ্বিতীয় সংস্করণ : আগষ্ট ১৯৫৫

মূল্য : চার টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীউপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস. এম্. এ. (কম্.), বি. এল.
আই. এন. এ. প্রেস
১৭৩, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রিয়বরেষু

॥ বিষয়-সূচী ॥

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ধারা ও অন্নদামঙ্গল

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বাংলা মঙ্গলকাব্যধারার শেষ যুগের কবি। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যের দরবারে মঙ্গলকাব্যগুলি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের সময়ে আসিয়া এই কাব্যধারার গতি প্রায় রুদ্ধ হইয়া যায়। ভারতচন্দ্র শেষবারের মত মঙ্গলকাব্যধারাকে তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তির দ্বারা পুষ্ট করিয়া তুলিলেন। ভারতচন্দ্রের পরই বাংলা সাহিত্যের এই দীর্ঘস্থায়ী ধারাটির গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। ভারতচন্দ্রের বেশ কিছুদিন পূর্ব হইতেই কাব্যরসিক বাঙ্গালী পাঠক মঙ্গলকাব্যের একঘেঁয়েমিতে প্রায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্র 'নূতন মঙ্গল' লিখিয়া পাঠকদের বিরক্তি অপনোদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং এক অনাস্বাদিত-পূর্ব কাব্যরসের যোগান দিয়া বেশ কিছুকাল বাঙ্গালী পাঠককে মাতাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রই মঙ্গলকাব্যধারার শেষ কবি।

বাংলা সাহিত্যের প্রায় জন্মলগ্ন হইতেই মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন হইলেও এইগুলির বক্তব্য এক। কোন বিশেষ দেবতার পূজা কি করিয়া পৃথিবীতে প্রচারিত হইল, ঐ দেবতার মাহাত্ম্য এবং তাঁহাকে পূজা করিলে কিরূপ সুখ ও সমৃদ্ধিতে বাস করা যাইবে সমস্ত মঙ্গলকাব্যের বক্তব্য হইল এই। বিভিন্নপ্রকার মঙ্গলকাব্যের যে সকল দেবতা পূজিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই পৌরাণিক দেবতা নহেন, তাঁহাদের অনেকেই লৌকিক। এই পৌরাণিক পরবর্তী যুগের লৌকিক দেবতাদের আবির্ভাবের পশ্চাতে কতকগুলি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে পৌরাণিক দেবতাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অন্তিম অবস্থায় খৃষ্টীয় নবম-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ কর্তৃক কিছু কিছু লৌকিক দেবদেবীর সৃষ্টি হয়। ঐ সময় বহিরাগত মুস্লিমশক্তির অত্যাচারের পটভূমিকাতেও কিছু কিছু লৌকিক দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটে। এই সকল লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়াই মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণের উদ্ভবের কারণটি আমাদিগকে এইবার বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বাংলাদেশ বহিরাগত মুস্লিমশক্তির নিকট পরাভূত হয়। এই বহিরাগত তুর্কী মুসলমানদের ধর্মান্ধতা ও অত্যাচার-প্রবণতা বাংলাদেশের উপর দিয়া এক প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত করাইয়া দিল। ইহারা বাঙ্গালীর বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র প্রধান বৌদ্ধবিহারগুলি এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-অধ্যুষিত গ্রামগুলি একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। ফলে সেন রাজাদের আমল হইতে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল তাহার স্রোত অকস্মাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। তুর্কীদের ধ্বংসলীলার প্রায় দুইশত বৎসর পর পুনরায় বাংলাদেশে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হইল এবং এই সময়ই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত কোন মঙ্গলকাব্যের পুঁথি যদিও পাওয়া যাইতেছে না তথাপি বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের কাল বা যুগ বলিতে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালকেই বুঝিতে হইবে। এই যুগে রচিত এক শ্রেণীর ধর্মকেন্দ্রিক আখ্যান-কাব্যই মঙ্গলকাব্য।

ত্রয়োদশ অষ্টাদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের কাল বলিলেও এবং এই কাব্যগুলির উদ্ভবের মূলে অত্যাচারী বৈদেশিক শক্তির প্রভাব কিছু পরিমাণ থাকিলেও আসলে এই কাব্যগুলির উৎস আরও অতীত যুগে অনুসন্ধান করিতে হইবে। আর্য-ব্রাহ্মণরা বরাবরই বাংলাদেশকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাই বলিয়া বাংলাদেশ অসভ্য বর্বরদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল না। এই অঞ্চলের অনার্য অধিবাসীরা তাহাদের নিজস্ব এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক। বাংলাদেশে যাঁহারা প্রাক্-মুস্লিম যুগে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজারা দীর্ঘকাল বাংলাদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারাও কৃষিভিত্তিক বাঙ্গালী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ ধার ধারিতেন না। পরন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিরই তাঁহারা পরিপোষকতা করিয়াছিলেন। পাল রাজাদের পরবর্তী সেন রাজবংশ তো পূর্ণোদ্যমে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারে তৎপর ছিলেন। ফলে একই কালে বাংলাদেশে উপরে উপরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব চলিতে থাকিলেও কৃষিভিত্তিক সভ্যতাজাত বাঙ্গালীর লৌকিক সংস্কৃতি অন্তঃশীলা ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত ছিল।

পাল রাজাদের সময়েই যে বাঙ্গালীর লৌকিক সংস্কৃতি বাংলাদেশের সামাজিক জগতে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া

যায় সংস্কৃতের প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বাংলা ভাষার উদ্‌বর্তনে এবং সেই ভাষায় রচিত চর্যাগীতিতে, যাহাতে বাংলার লোকজীবনের চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সমগ্র উত্তরভারত হইতে বিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে আসিয়া আত্মরক্ষার শেষ ঘাঁটি প্রস্তুত করিল। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। এই প্রভাবকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বৌদ্ধরা (মহাযান সম্প্রদায়) নিজেদের ধর্মমতের (তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম) সঙ্গে বাংলাদেশের লৌকিক ধর্মসংস্কারের মিশ্রণ আরম্ভ করিল। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের দেবদেবীরা অত্যন্ত বীভৎস ও ক্রুর প্রকৃতির ছিলেন। তুর্কিরা বাংলাদেশে যে বর্বরোচিত অত্যাচার করিয়াছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সমাজে এই সকল দেবতার একটা সমর্থন থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল। আর এই সকল উগ্রদেবতাকে নানা উপচারে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে বিবিধ অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে মানুষের এই স্বাভাবিক বিশ্বাসের সুযোগে ইঁহারা অচিরাৎ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ফেলিলেন।

মানুষের মন সাধারণতঃ আপন আপন স্বার্থচিন্তাতেই মগ্ন থাকে। কি ভাবে চলিলে, কোন্ পথ ধরিলে ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে থাকা যাইবে মানুষ সর্বদা তাহাই ভাবে। সুখ, স্বাস্থ্য, ধন, শত্রুর পরাভব প্রভৃতি কামনার দ্বারা পীড়িত মানুষের মন পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকে। কাজেই যে সকল দেবতা মর্ত্যে আগমন করিয়া মানুষকে সুখ-সমৃদ্ধির পন্থা বাতলাইয়া দেন তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা আদরণীয় হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি? তাই আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধদেব যখন মানুষের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই ধূলিধূসরিত ধরণীর মানব-সমাজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন তখন ভাব-সর্বস্ব হিন্দুর দেবদেবীগণকে আর অলৌকিক স্বর্গধামে রাখা গেল না। তাঁহারাও পৃথিবীতে নামিয়া আসিলেন এবং মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারে অগ্রসর হইলেন। ঐ সকল দেবতার মর্ত্যলীলার কাহিনী পুরাণগুলিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণের মধ্যেও বাস্তব সংসারের প্রয়োজন অতিশয় সুস্পষ্ট। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে এইরূপ স্বার্থবুদ্ধিজাত দেবতাকুলের সহজ স্বীকৃতি ছিল না। কাজেই পৌরাণিক দেবতারা যে উপেক্ষিত হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

বাংলা মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবতাদের উৎপত্তির কারণগুলি মোটামুটি এইরূপ, (১) আর্য-সংস্কৃতির প্রভাবাধীন থাকিয়াও বাংলার কৃষিভিত্তিক লৌকিক

ধর্ম-সংস্কার লৌকিক ধর্মমতের সৃষ্টি করিতেছিল, (২) অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধরা নিজেদের ধর্মমতের সঙ্গে ঐ সকল লৌকিক ধর্মমতকে মিশাইয়া নূতন নূতন দেবদেবীর সৃষ্টি করিতেছিল, (৩) মুসলমান ধর্মমত ও অত্যাচারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অসহায় জনসাধারণ এক অলৌকিক দৈবশক্তির কল্পনা করিল এবং সেই শক্তিকে নানাভাবে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে ব্যস্ত হইল। এই সকল দেবতার মধ্যে বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাদের উদার ও কারুণিক-রূপ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না এবং এই দেবতারা নীচ, ক্রূর, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং ভয়ানক স্বার্থপর। ভক্ত যেমন নিত্য-প্রয়োজনে তাঁহাদিগকে কাজে লাগায় তাঁহারও তেমনি ভক্তের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লন। একটু ত্রুটি ঘটিলেই সর্বনাশ। ভক্তকে তখন তাঁহারা ধনে-প্রাণে সংহার করেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমরা এই সকল ভীষণ প্রকৃতির দেবতার সাক্ষাৎ পাই। পরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এই ক্রূরমনা দেবতাবৃন্দ শান্ত ও করুণাময় হইয়া পড়িলেন। উগ্রা চণ্ডী শেষ পর্যন্ত অভয়দাত্রী ও অন্নদাত্রী অভয়া ও অন্নদায় পরিণত হইলেন।

যে হানাহানি ও বিরোধের পটভূমিকায় মঙ্গলকাব্যের ক্রূরমনা ও প্রতি-হিংসাপরায়ণ দেবকুলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যে পূজিতা দেবী তাঁহাদের সমগোত্রীয়া নহেন, যদিও এই দেবী পূর্ববর্তী যুগের মঙ্গল-কাব্যে আরাধ্যা শান্তোগ্র দেবীরই পরিবর্তিত রূপ। ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা যদিও অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল তবুও ষোড়শ ও সপ্তদশ এই দুইটি শতাব্দীতে বাংলাদেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ অবস্থাই বিরাজমান ছিল। যে সামাজিক পটভূমিকায় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর লৌকিক দেবকুলের আবির্ভাব ভারতচন্দ্রের সময়কার সামাজিক অবস্থা তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের ছিল। অবশ্য ভারত-চন্দ্রের অন্নদা বা অন্নপূর্ণা শান্তশ্রী-সমন্বিত স্নেহময়ী মাতৃমূর্তির প্রতীক হওয়ার অন্য কারণও বিদ্যমান ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুত্থান এবং বৈষ্ণব প্রভাব এই কারণের অন্যতম। তদুপরি, "তখনকার নানা বিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্তন-ব্যাকুল দুর্গতির দিনে শক্তিপূজারূপে এই যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। যে ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে, সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ব

অবস্থায় পরিহার করে। যথার্থ ভক্তি সুতীব্র কঠিন শক্তিকে গোড়ায় যদি বা প্রাধান্য দেয়, শেষকালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর, কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে। বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে,—মাতা, পত্নী ও কন্যা রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গল-সুন্দররূপে দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে যে রসের সঞ্চার করিয়াছিল, চণ্ডীপূজার সেই 'পরিণাম-রমণীয়তার' নিদর্শন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'।"

চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী ও অন্নদা—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শক্তিদেবতার বিভিন্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায়,—যেমন, দুর্গা, নারায়ণী, সতী, ভগবতী, গৌরী, পার্বতী, সনাতনী, সর্বাণী, সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, চণ্ডী ইত্যাদি। অবশ্য এই বিভিন্ন শক্তিদেবতা পরিণামে শিবের একমাত্র পত্নীরূপে অর্থাৎ শক্তিরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছেন। একমাত্র শক্তির বিভিন্ন নাম হইলেও এবং পরিণামে এই শক্তিতে পরিণতি লাভ করিলেও ইহাদের উদ্ভবের ইতিহাস পরস্পর স্বতন্ত্রই ছিল।

দেবী অন্নদা বা অন্নপূর্ণার উদ্ভবের উৎস সন্ধান করিতে গেলে আমাদিগকে অনিবার্যভাবেই চণ্ডীদেবীকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার ধারাটি অনুধাবন করিতে হইবে। এই সাহিত্যের তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়—(১) মহিষমর্দিনী চণ্ডীর ধারা। অসুরদের সম্রাট মহিষাসুর একবার দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে দেবরাজ পরাভূত হইলেন এবং মহিষাসুর ইন্দ্রত্ব লাভ করে। তখন দেবরাজের দুর্গতির সীমা রহিল না। সমস্ত দেবতা গিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। মহিষাসুরের অত্যাচারের বিবরণ শুনিয়া বিষ্ণু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন আর অন্যান্য দেবতারা তো ক্রোধাকুল ছিলেনই। ক্রুদ্ধ দেবকুলের মুখ হইতে তেজ নির্গত হইতে লাগিল। সেই অশেষ তেজঃপুঞ্জ হইতে ত্রিভুবন-উজ্জ্বলকারিণী এক দেবী সমুদ্ভূতা হইলেন। সমস্ত দেবতা বিভিন্ন অস্ত্র দিয়া এই দেবীকে রণ-সাজে সজ্জিত করিয়া দিলেন। ইনিই মহিষাসুরমর্দিনী। 'চণ্ডিকা-বিজয়', 'দুর্গামঙ্গল', কাব্যে এই দেবী বন্দিতা হইয়াছেন। (২) মঙ্গলচণ্ডীর ধারা—কালকেতু ও ধনপতি উপাখ্যানে অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যসমূহে বন্দিতা দেবী। (৩) অন্নদা বা অন্নপূর্ণার ধারা—অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে এই দেবীর বন্দনা করা হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রই এই কাব্যধারার প্রবর্তক। তাই তিনি তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

ভারত ও পদআশে **নূতন মঙ্গল** ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

এই অন্নদাই আবার দেবী কালিকা। অন্নদামঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে কালিকা দেবীরই মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী হইতে অন্নদা বা কালিকার রূপান্তর পর্যন্ত ধারাটাকে আমরা এইভাবে বিভক্ত কবিতে পারি—(১) চণ্ডীদেবী। ইনি উগ্র প্রকৃতির দেবতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইঁহার প্রথম আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইনিই পরবর্তী যুগে দেবী দুর্গারূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। (২) চণ্ডীদেবীর সঙ্গে নানা পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীব মিশ্রণজাত মঙ্গলচণ্ডী দেবী—ইনি শান্তোগ্র দেবতা। (৩) ইনিই পরিণামে 'সন্তানকে দুধেভাতে' রাখিবার দেবতা বা অন্নদা বা অন্নপূর্ণা হইয়া একেবারে পরিপূর্ণ মাতৃমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন।

দেবী অন্নদার সঙ্গে আবার বৈদিক অরণ্যানী দেবতার বেশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বেদে অদিতি, পৃথ্বী, সীতা, অরণ্যানী প্রভৃতি ভূমি ও শস্যদেবতাদের কথা পাওয়া যায়। এই দেবতাদের মধ্যে দেবীমাতা অদিতিই প্রধান। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর উদ্ভব এই পুবাণে বর্ণিত হইয়াছে) দেবী বলিয়াছেন যে, তিনিই পৃথিবীকে ফলে, শস্যে পূর্ণ করিয়া তোলেন এইজন্যই তিনি শাকম্ভরী। শারদীয়া দুর্গাপূজাব একটি প্রধান অঙ্গ নবপত্রিকা পূজা। কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান প্রভৃতি দ্বারা এই পূজা করা হইয়া থাকে। এই পূজা ভূমিমাতার পূজা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই যে অন্নদা বা অন্নপূর্ণা যাবতীয় জীবের অন্নের সংস্থান করিয়া থাকেন তাঁহাকে ভূমি বা শস্যদেবতারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, দুর্গা বা অন্নদা বা অন্নপূর্ণা—ইঁহারা একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। তবে ইঁহাদের বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হইবার বিভিন্ন কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ বা নিদর্শন কাব্যে ও প্রস্তরশিল্পে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতেই দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ১১-১২শ শতাব্দীতে আসিয়া লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশসমন্বিত মহিষমর্দিনী দুর্গা-প্রতিমার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর ১৪শ হইতে ১৮ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলা কাব্যে মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনীর সঙ্গে উমা-

মহেশের কাহিনী যুক্ত হইতে দেখি। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের মধ্যে এই দেবীকেই কালিকাদেবীরূপে বন্দিত হইতে দেখিতে পাই। তারপর অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রে আসিয়া অন্নদামূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। তান্ত্রিক বা বৌদ্ধতান্ত্রিক, পৌরাণিক, লৌকিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রভাবে এই দেবী একেক সময় একেক মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। অবশ্য তাহার সঙ্গে সামাজিক কারণ তো ছিলই।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও অন্নদামঙ্গল—বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনামূলক মঙ্গলকাব্যগুলিকে প্রধানতঃ এই কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) মনসামঙ্গল—ভারতে সর্প পূজার এক বিরাট ইতিহাস রহিয়াছে। সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা। মনসার পূজা বাঙ্গালাদেশেই বিশেষ জনপ্রিয়। কারণ সর্পভীতি বাঙ্গালাদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক। মনসামঙ্গল কাব্যের ধারাটি হইতেছে—(১) আদি কবি হরিদত্ত। তাঁহার কাব্য-রচনার কাল ও কাব্যসম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যের একান্ত অভাব। তবে মনে হয় তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেকার লোক ছিলেন, (২) নারায়ণদেব—মনসামঙ্গলের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি। আবির্ভাব কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ (৩) বিজয়গুপ্ত—পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগ, (৪) বিপ্রদাস পিপলাই—ঐ, (৫) গঙ্গাদাস সেন—ষোড়শ শতাব্দী, (৬) দ্বিজ বংশীদাস —ঐ, (৭) কালিদাস—সপ্তদশ শতাব্দী, (৮) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ—মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি—সপ্তদশ শতাব্দী, (৯) জগজ্জীবন ঘোষাল—ঐ, (১০—১৫) ষষ্ঠীধর দত্ত, রামজীবন, জীবন মৈত্র, দ্বিজ রসিক, বিষ্ণুপাল, বাণেশ্বর রায়—ইহারা সকলে ১৭—১৮শ শতাব্দীর লোক। ইহা ছাড়া আরও অনেক অখ্যাত কবির রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

(খ) শিবমঙ্গল—বৈদিক এবং পৌরাণিক শিবের কৃষি-দেবতায় পরিণতি লাভ, যেহেতু নিরাপদ ও সমৃদ্ধ কৃষিকর্মের জন্য অনার্য বাঙ্গালীর একজন কৃষিদেবতার প্রয়োজন ছিল। শিবের ছড়া ও গীত বাঙ্গালাদেশে কবে হইতে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বলা দুষ্কর। কাহিনীর আকারে রচিত শিবমঙ্গল কাব্যের কবি হইতেছেন, (১) রামকৃষ্ণ রায়—সপ্তদশ শতাব্দী, (২) শঙ্কর কবিচন্দ্র—ঐ, (৩) রামেশ্বর ভট্টাচার্য—শিবায়ন কাব্য—অষ্টাদশ শতাব্দী,—ইহাই শ্রেষ্ঠ শিবমঙ্গল কাব্য, (৪) দ্বিজ কালিদাস—অষ্টাদশ শতাব্দী, (৫) দ্বিজ

মণিরাম—ঐ। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অখ্যাত কবি শিবমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ ও আদিনাথ অঞ্চলে শৈব প্রভাব বর্ধিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের কোন কোন কবি একশ্রেণীর শিবমঙ্গল কাব্য রচনা করেন যাহাদের সঙ্গে উপরে বর্ণিত কাব্যগুলির কোন যোগ নাই। ঐ সকল কবি তাঁহাদের কাব্যের নামকরণ করিয়াছিলেন 'মৃগলুব্ধ সংবাদ'—কারণ কাব্যের কাহিনীতে পৌরাণিক মৃগ ও লুব্ধকের কাহিনী আছে। এই কাব্যগুলি সংস্কৃত পুরাণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত।

(গ) ধর্মমঙ্গল—রোগ, শোক হইতে পরিত্রাণের জন্য, নিঃসন্তানা জননীকে সন্তানদানের জন্য এবং অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টিদানের জন্যই প্রধানতঃ ধর্মঠাকুরের প্রচলন হয়। ইনি একেবারেই অনার্য দেবতা। ধর্মমঙ্গলের কবিবৃন্দ হইতেছেন, (১) ময়ূরভট্ট—আবির্ভাব কাল, স্থান এবং কাব্য—সব কিছুই অনিশ্চিত, (২) আদি রূপরাম—ঐ, (৩) খেলারাম—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, কাব্য অসম্পূর্ণ, (৪) মাণিকরাম গাঙ্গুলী—আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে প্রচুর বিতর্ক রহিয়াছে। অনুমান ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ, (৫) রূপরাম—ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ, (৬) শ্যাম পণ্ডিত—অষ্টাদশ শতাব্দী, (৭) সীতারাম—ঐ, (৮) রামদাস—সপ্তদশ শতাব্দী, (৯) প্রভুরাম—অষ্টাদশ শতাব্দী, (১০) ঘনরাম চক্রবর্তী—অষ্টাদশ শতাব্দী, ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি, (১১) সহদেব চক্রবর্তী—অষ্টাদশ শতাব্দী, (১২) নরসিংহ—ঐ, (১৩-১৫) হৃদয়রাম, গোবিন্দরাম, রামনারায়ণ—ঐ। এবং আরও কয়েকজন অনুল্লেখ যোগ্য কবি।

(ঘ) কালিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল—মধ্যযুগের নিদারুণ অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ভয়ঙ্করী কালিকাদেবীর বিশেষ আবেদন থাকিবারই কথা। এই ভয়ঙ্করী দেবীকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে সর্বপ্রকার বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে এই বিশ্বাস তখনকার দিনে কিছু অস্বাভাবিক নহে। কালিকামঙ্গল কাব্যের রচয়িতাবৃন্দ হইতেছেন, (১) কবি কঙ্ক—ষোড়শ শতাব্দী, (২) শ্রীধর—ঐ, (৩) গোবিন্দদাস—ঐ, (৪) কৃষ্ণরামদাস—সপ্তদশ শতাব্দী, (৫) প্রাণরাম চক্রবর্তী—ঐ, (৬) বলরাম চক্রবর্তী—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ, (৭-৮) ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ—অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ, (৯-১১) নিধিরাম আচার্য, দ্বিজ রাধাকান্ত ও কবীন্দ্র।

চণ্ডীমঙ্গল—(১) মাণিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি বলা হয়। মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে লিখিয়াছেন যে, ইঁহারই কাব্য অবলম্বনে তিনি

চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল স্থির করা যায় নাই। কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। (২) মাণিক দত্তের পরই দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। মাধবের কাব্যের নাম মঙ্গলচণ্ডীর গীত। মাধব ও মুকুন্দরাম সমসাময়িক ছিলেন। মাধবের কাব্যের রচনাকাল ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ। (৩) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। মুকুন্দরামের কাব্যের রচনাকাল ১৫৯৪ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়। (৪) দ্বিজ রামদেব—অভয়া মঙ্গল। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অঞ্চলে চণ্ডীপূজার যে ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল ঐ কাব্যে তাহাই রূপ পাইয়াছে। (৫) মুক্তারাম সেন—সারদামঙ্গল। চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক। কাব্য রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। (৬) দ্বিজ হরিরাম—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কবি। তাঁহার কাব্যে মুকুন্দরামের প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট।

অতঃপর চণ্ডীদেবীকে অন্নদা বা অন্নপূর্ণাতে রূপান্তরিত হইতে দেখা যায় এবং ঐ দেবীকে বন্দনা করিয়া যে সকল কাব্য রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সর্বশ্রেষ্ঠ।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য—শীতলামঙ্গল—বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, রায়মঙ্গল—সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতার বন্দনা; ষষ্ঠীমঙ্গল—নবজাত শিশুদের জীবন রক্ষার জন্য এই দেবীর বন্দনা। এছাড়া সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, বাশুলীমঙ্গল এবং ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত আরও মঙ্গলকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।)

কবিবর ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ববর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় ঐ যুগেরই মানুষ ছিলেন। তাঁহার বিচিত্র জীবনকাহিনী আজ হয়তো অন্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া যাইত যদি না তাঁহার তিরোধানের একশত বৎসরের মধ্যেই অপর একজন কবি নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার জীবনী লিখিয়া না রাখিতেন। আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথাই বলিতেছি। ১৮৫৩ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকায় গুপ্ত কবি কতিপয় প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালার জীবনকাহিনী ও অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'কবিবর ভারতচন্দ্র

রায়গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বৃত্তান্তে কিছু কিছু ভ্রমপ্রমাদ হয়তো আছে কিন্তু ইহাই ভারতচন্দ্রের একমাত্র প্রামাণিক জীবনী। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি :—

৺নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি "ভুরস্থট" পরগণার মধ্যস্থিত "পেঁড়ো" নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি অতি সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগের সম্মানপূর্ব্বক "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি "ভরদ্বাজগোত্রে" মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বিষয়-বৈভবের প্রাধান্য জন্য "রায়" এবং "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার বাটীর চতুর্দ্দিকে গড়বন্দি ছিল, এ কারণ সেই স্থান "পেঁড়োর গড়" নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ "চতুর্ভুজ রায়" মধ্যম "অর্জ্জুন রায়" তৃতীয় "দয়ারাম রায়" এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ "ভারতচন্দ্র রায়"। এই বিশ্ববিখ্যাত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহাশয় ১৬৩৪ শকে (১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে) শুভক্ষণে অবনী-মণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।

এমত জনরব, যে, অধিকারভুক্ত ভূমি সংক্রান্ত সীমা সম্বন্ধীয় কোন এক বিবাদসূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন, ঐ সময়ে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র অতিশয় শিশু ছিলেন, তাঁহার মাতা মহারাণী সেই দুর্ব্বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কোপান্বিতা হইয়া "আলমচন্দ্র" ও "ক্ষেমচন্দ্র" নামক আপনার দুই জন রাজপুত সেনাপতিকে কহিলেন, "হয় তোমরা এই ক্রোড়স্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে এখনি বিনাশ কর, নয়, এই রাত্রির মধ্যেই "ভুরস্থট" অধিকার করিয়া আমার হস্তে প্রদান কর, ইহা না হইলে আমি কোন মতেই জল গ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত উক্ত সেনাপতিদ্বয় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সেই রজনীতেই "ভবানীপুরের গড়" এবং "পেঁড়োর গড" বল দ্বারা অধিকার করিয়া লইল। পর দিবস প্রাতে বিষ্ণুকুমারী পেঁড়োর গড়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভূপতি নরেন্দ্র রায় ও তাঁহার পুত্রগণ এবং কর্ম্মচারী পুরুষ মাত্রে কেহই নাই, সকলেই পলায়ন করিয়াছেন, কেবল কতকগুলি স্ত্রীলোকমাত্র অতিশয় ভীতা ও কাতরা হইয়া হা! হা! শব্দে রোদন করিতেছেন।—মহারাণী সেই কুলাঙ্গনাগণকে অভয়বাক্যে প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করত কহিলেন "তোমাদিগের কোন ভয় নাই, স্থির হও, স্থির হও, কল্য একাদশী গিয়াছে,

আমি উপবাস করিয়া রহিয়াছি, আমাকে শালগ্রামের চরণামৃত আনিয়া দেহ, তবে আমি জল গ্রহণ করিতে পারি।" এই বাক্যে পূজক ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অমনি তাঁহার সম্মুখে "লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা" আনয়নপূর্ব্বক স্নান করাইয়া চরণামৃত প্রদান করিলেন, রাণী অগ্রে তাহা গ্রহণ করিয়া পরে জলপান করিলেন। অনন্তর শালগ্রাম এবং অন্যান্য ঠাকুরের সেবা নিমিত্ত কিয়দংশ ভূমি দান করিলেন, আর ভবানীপুরের কালীর ভোগ-রাগের জন্য প্রতিদিন এক টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন কিন্তু যে সকল অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়াছিলেন তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিলেন না, শুদ্ধ গড়, গৃহ, পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি পুনঃ প্রদানপূর্ব্বক বর্দ্ধমানে পুনর্গমন করিলেন।

এতদ্‌ঘটনায় নরেন্দ্র রায় একক নিঃস্বই হইলেন, সর্ব্বস্বই গেল, কোনরূপে কায়ক্লেশে দিনপাত করিতে লাগিলেন।—এই সময় কবিবর ভারতচন্দ্র পলায়ন-করত মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজীপুরের সান্নিধ্যে "নওয়াপাড়া" নামক গ্রামে আপনার মাতুলালয়ে বাস করত তাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ এবং অভিধান পাঠ করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয় গ্রন্থে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়া ঐ মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুরের সান্নিধ্য সারদা নামক গ্রামের কেশরকুনি আচার্য্যদিগের একটি কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই বিবাহের পর তাঁহার অগ্রজ সহোদরেরা অতিশয় ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন "ভারত! তুমি আমাদের সকলের কনিষ্ঠ হইয়া এমন অনিষ্টকর কার্য্য কেন করিলে? সংস্কৃত পড়াতে কি ফলোদয় হইবে? তোমার এ বিদ্যার গৌরব কে করিবে? শিষ্য নাই ও যজমান নাই, যে, তাহাদিগের দ্বারা সমাদৃত হইবে ও প্রতিপালিত হইবে।" জগদীশ্বরেচ্ছায় এই তিরস্কার তাঁহার পক্ষে পুরস্কার অপেক্ষাও অধিক কল্যাণ-কর হইল, কারণ তিনি তচ্ছ্রবণে অতিশয় অভিমান-পরবশ হইয়া জিলা হুগলির অন্তঃপাতি বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিম দেবানন্দপুর গ্রামনিবাসী কায়স্থ-কুলোদ্ভব মান্যবর ৺রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের ভবনে আগমনপূর্ব্বক পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, মুন্সীবাবুরা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহপূর্ব্বক বাসা দিয়া সিধা দিয়া সুনিয়মে সদুপদেশ করিতে লাগিলেন। এই কালে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা কাহারো নিকট প্রকাশ করেন না এবং রীতিমত কোন বিষয়েরি বর্ণনা করেন না।—সময়বিশেষে কেবল মনে মনে তাহার আন্দোলন মাত্র

করিয়া থাকেন।—নচেৎ প্রতিনিয়তই শুদ্ধ বিদ্যাভ্যাসে পরিশ্রম করেন, অপর কোন ব্যাপারের আমোদ প্রমোদে কালক্ষয় করেন না। দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া সেই অন্ন দুই বেলা আহার করেন। প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটা বেগুন পোড়ার অর্দ্ধ ভাগ এবেলা এবং অর্দ্ধ ভাগ ওবেলা আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত মুন্সী বাবুদিগের বাটীতে এক দিবস সত্যনারায়ণের পূজার সির্ণি, এবং কথা হইবে তাহার সমুদয় অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইয়াছে—কর্ত্তাটি কহিলেন "ভারত, তোমার সংস্কৃত বোধ আছে, বাক্‌পটুতা উত্তম।—অতএব তোমাকেই সত্যনারায়ণের পুঁথি পাঠ করিতে হইবেক—গুণাকর ইহাতে সম্মত হইলে মুন্সী পুঁথি আনয়নের নিমিত্ত এক জনের প্রতি আদেশ করিলেন, তচ্ছ্রবণে রায় কহিলেন, "মহাশয়!—পুঁথি আনাইবার আবশ্যক করে না—আমার নিকটেই পুস্তক আছে, পূজা আরম্ভ হউক, আমি বাসা হইতে পুঁথি আনিয়া এখনি পাঠ করিব।"—এই বলিয়া বাসায় গিয়া তদ্দণ্ডেই অতি সরল সাধুভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতায় পুঁথি রচিয়া শীঘ্রই সভাস্থ হইয়া সকলেব নিকট তাহা পাঠ করিলেন, যাঁহারা সেই কবিতা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা মোহিত হইয়া সাধু সাধু ও ধন্য ধন্য ধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্রন্থেব সর্ব্বশেষে ভারতের নামের "ভণিতা" এবং সবিশেষ পরিচয় বর্ণিত হওয়াতে সকলে আরো অধিক আশ্চর্য্য জ্ঞান কব্রিলেন।—সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে কহিলেন।—ভারত!—তুমিই সাধু।—সরস্বতী তোমার মুখাগ্রে নৃত্য করিতেছেন।—তুমি সামান্য মনুষ্য নহ।—তোমার অসাধারণ ক্ষমতা ও অলৌকিক সাধ্য দৃষ্টে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।

... ...

এই কবিতা যৎকালে রচনা করেন তৎকালে ভারতের বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। যদিও এতন্মধ্যে কোন কোন স্থানে মিলের কিঞ্চিৎ দোষ আছে, কিন্তু গুণাকরের এ দোষ দোষের মধ্যেই ধর্ত্তব্য হইতে পারে না,—কারণ একে বয়সের স্বল্পতা, এবং সময়ের স্বল্পতা, তাহাতে আবার এই রচনা প্রথম রচনা—ইনি সর্ব্বশেষে যে সকল গ্রন্থ বিরচন করেন তাহার তুলনা প্রায় দেখিতে পাই না।

উল্লেখিত ব্রতকথা ব্যতিরেকে চৌপদীচ্ছন্দে আর একটি কথা রচনা করেন।—লেখকের লেখার দোষে তাহার স্থানে স্থানে অতিশয় প্রমাদ

ঘটিয়াছে। কতক পারস্য, কতক বাঙ্গালা ও কতক সংস্কৃত "সাত নকলে আসল খাস্ত" তাহাই হইয়াছে। কোন কোন পদের চারি পাঁচটা কথাই নাই, সুতরাং অর্থ সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন হইয়াছে।—কি করি, উপায় নাই, আর একখানা হাতের লেখা পাইলে ঐক্য করিয়া দেখা যাইত।

এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে তিনি কোন্‌খানি প্রথম বিরচনা করেন তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না,—কিন্তু অনুমানে এরূপ স্থির হইতেছে যে, ত্রিপদীটিই সর্ব্বাগ্রে রচনা করিয়াছিলেন।—যেহেতু চৌপদীটি ইহার অপেক্ষা অল্লাংশেই উত্তম হইয়াছে। সময়াভাবশতঃ প্রথম বারের কথা অতি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিয়াছেন।—ফলে তিনি দুই জন নায়কের আদেশক্রমে দুইখানি পুঁথি দুই বার প্রস্তুত করত পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ চৌপদীচ্ছন্দের গ্রন্থখানির সর্ব্বশেষে ভণিতা স্থলে যেরূপ বর্ষের নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহাতে সেইখানিকেই অনুজ বলিয়া ধার্য্য করিতে হইবে।—যথা "সনে রুদ্র চৌগুণা" এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে ১১৩৪ সালে এই কবিতা রচিত হয়।—সুতরাং তৎকালে ভারতের বয়স ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, কারণ শকের সহিত সালের গণনা করাতেই নির্দ্দিষ্ট হইল তিনি বাঙ্গালা ১১১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্রূপ তরুণ বয়সে যে প্রকার চমৎকার কবিতাশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত, পারস্য, হিন্দি এবং বঙ্গভাষার যদ্রূপ সংস্কার দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্টই প্রশংসা করিতে হইবে।—জগদীশ্বরের বিশেষ অনুকম্পা ব্যতীত কোনক্রমেই এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতচন্দ্র রায় পারস্য ভাষায় বিশেষরূপ কৃতবিদ্য হইয়া অনুমান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বাটী আসিয়া পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহার অগ্রজগণ দেখিলেন, তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার ন্যায় সদ্বিদ্বান্ ও কীর্ত্তিকুশল হইতে পারেন নাই, অনুজের এতদ্রূপ বিদ্যা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "ভাই হে! সংপ্রতি পিতাঠাকুর বর্দ্ধমানেশ্বরের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভূমি ইজারা লইয়াছেন, জগদীশ্বরের কৃপায় এবং কর্ত্তার আশীর্ব্বাদে তুমি সর্ব্বতোভাবে যোগ্য এবং কৃতী হইয়াছ, অতএব এই সময়ে তুমি আমাদিগের এই বিষয়ের "মোক্তার" স্বরূপ হইয়া বর্দ্ধমানে গমন কর, রাজাকে রাজস্ব দিতে যেন বিলম্ব না হয়, এবং

রাজদ্বারে যেন কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত না হয়, তুমি উপস্থিত মতে যখন যেরূপ পত্র লিখিবে, আমরা তদনুরূপ কার্য্য করিব।—ভাই! তাহা হইলেই আমাদিগের অন্নবস্ত্রের আর কোনরূপ ক্লেশ থাকিবে না।" সেই আজ্ঞানুসারে ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানে গমন করত কিছু দিন অবস্থানপূর্ব্বক কার্য্য পরিচালন করেন, এমত সময়ে তাঁহার সহোদরেরা যথানিয়মে নির্দ্দিষ্ট কালে কর প্রেরণে অক্ষম হইলেন, ইহাতে রাজদরবারে বিবিধপ্রকার গোলযোগ হওয়াতে বর্দ্ধমা'ধিপতি সেই ইজারাটি খাসভুক্ত করিয়া লইলেন, এবং ভারত তদ্বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত করাতে দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তে পড়িয়া কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু কারাগারের কঠোর ক্লেশ তাঁহাকে অধিক কাল ভোগ করিতে হয় নাই। কারারক্ষকের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রণয় ছিল, অতিশয় কাতর হইয়া বিনয়বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "ও মহাশয়! অমুক অমুক স্থানে খাজনা বাকী আছে আপনারা লোক পাঠাইয়া আদায় করিয়া লহ, আমাকে এরূপে বদ্ধ রাখিয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে কি ফলোদয় হইবে?" এতদ্রূপ বিনয় বচনে প্রসন্ন হইয়া কারাধ্যক্ষ কহিলেন "আমি এই দণ্ডেই তোমাকে গোপনে গোপনে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারি, কিন্তু তুমি কোন্ ভাবে কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়া নিস্তার পাইবে, সে বিষয়ের কিছু উপায় স্থির করিয়াছ? এই রাজার অধিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে তুমি যেখানে থাকিবে সেইখানেই বিপদ্ ঘটিতে পারে; রাজা ও রাজ-কর্ম্মচারীরা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে বিস্তর দুরবস্থা করিবেন।" ভারত উত্তর করিলেন "আমাকে এই যাতনাযুক্ত কারাভুক্ত দায় হইতে মুক্ত করিলে আমি আর ক্ষণকালের জন্য এ অধিকারের ত্রিসীমানায় বাস করিব না। জলেশ্বর পার হইয়া "মারহাট্টার" অধিকারে গিয়া নিশ্বাস ফেলিব।" কারাপালক অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া রাত্রিকালে অতি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

ভারতচন্দ্র "রঘুনাথ" নামক একটি নাপিত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া মহারাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রধান রাজধানী কটকে আসিয়া "শিবভট্ট" নামক দয়াশীল সুবাদারের আশ্রয় লইলেন, এবং আপনার সমুদয় অবস্থা নিবেদন করিয়া শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তমধামে কিছু দিন বাস করণের প্রার্থনা করিলেন।—সুবেদার তাঁহার প্রতি প্রীতচিত্তে অনুকূল হইয়া কর্ম্মচারী, মঠধারী, ও পাণ্ডাদিগের উপর এমত আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন, যে "ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভৃত্য যে পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রে অধিবাস

করিবেন সে পর্য্যন্ত যেন কেহ ইঁহার নিকট কোনরূপ কর গ্রহণ না করে, ইনি বিনা করে তীর্থবাসী হইবেন, যখন যে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেই মঠে মানপূর্ব্বক স্থান পাইবেন, এবং ইঁহাদিগের আহারের নিমিত্ত প্রতিদিন এক একটি "বলরামী আটুকে" প্রদান করিবে, আর বিশেষরূপে সম্মান করিবে।"

ভারত পুরুষোত্তমে গিয়া রাজপ্রসাদে প্রাসাদভোগ ভোগ করত শ্রীশ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মঠে বাসপূর্ব্বক শ্রীভাগবত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের গ্রন্থসকল পাঠ করেন, সর্ব্বদাই বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হয়েন। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উদাসীনের ন্যায় গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন, তাঁহার ভৃত্যটিও সেই প্রকার আকার-প্রকার ও ভাবভঙ্গি ধারণ করিয়া চেলা সাজিল, প্রভুটি "মুনি গোঁসাই" হইলেন, দাসটি "বাসুদেব" হইল।

এক দিবস বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনধাম দর্শনের প্রার্থনা করিয়া ভারতেব নিকট তদ্বিশেষ প্রকাশ করাতে ভারত তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইতে অত্যন্ত ইচ্ছাকুল হইলেন। পরে সকলে একত্র হইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে যাত্রা করত পদব্রজে জিলা হুগলির অন্তঃপাতি খানাকুল, কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথাকার শ্রীশ্রী৺গোপীনাথজীর শ্রীমন্দিরে দর্শনার্থ গমন করিয়া দেখিলেন. কীর্ত্তন-কারী গায়কেরা "মনোহরসায়ি" কীর্ত্তন করণের অনুষ্ঠান করিতেছেন। সেই দেবমন্দিরে বৈষ্ণবদিগের সহিত একত্রে প্রসাদ পাইয়া কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। কৃষ্ণলীলারসামৃত পানপূর্ব্বক তৎকালে গুণাকর কবিবর অতিশয় মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া প্রেমাশ্রু পাতন করিতে লাগিলেন।

ঐ খানাকুল গ্রামে তাঁহার শালীপতি ভ্রাতার বাটী, রঘুনাথ ভৃত্য তাহা জ্ঞাত ছিল, এখানে ইনি মোহিত হইয়া সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন, ওদিকে রঘুনাথ গোপনে গ্রামের ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক ভট্টাচার্য্যের ভবনে গিয়া তাঁহার শালী এবং ভায়রাভাইকে বিস্তারিতরূপে সমুদয় বিবরণ অবগত করিল। তচ্ছ্রবণে ভট্টাচার্য্যেরা অনেকেই একত্রে দেবালয়ে আগত হইয়া গান সমাপ্তির পর বিস্তর প্রবোধ দিয়া ভারতচন্দ্রকে আপনারদিগের বাটীতে আনয়ন করত তৎক্ষণাৎ নাপিত ডাকাইয়া দাড়ি গোঁপ ফেলিয়া দিলেন এবং গেরুয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া উত্তমরূপ ধৌত বস্ত্র পরাইলেন, আর নানাপ্রকার অনুরোধ ও উপরোধ দ্বারা তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করত পুনর্ব্বার সংসারধর্ম্মে আসক্ত করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট লইয়া যাইতে পারিলেন না। রায় সেই প্রস্তাবে উত্তর করিলেন "আমি আপনাদিগের বিশেষ অনুরোধক্রমে তীর্থ ভ্রমণ, যোগ

সাধন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিষয়কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিব সে পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই গৃহে গমন করিব না।

কয়েক দিবস পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভায়রাভাই ভারতকে সঙ্গে লইয়া তাজপুরের পার্শ্বস্থ সারদা গ্রামে স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন, আচার্য্য বহু কালের পর "হারানিধি" জামাতাকে প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, মহাসমাদরপূর্ব্বক স্নেহের ভাণ্ডার মুক্ত করিলেন। অন্তঃপুরে আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল, প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনী সকলে আহ্লাদিতচিত্তে দেখিতে আইলেন।—ভারতচন্দ্র বিবাহ-বাসর ব্যতীত অপর কোন দিবস আপনার প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীর সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই, ইহাতে সেই রজনীর সাক্ষাতে পরস্পর উভয়ের মনে যে প্রকার সন্তোষ, প্রেম, ভাব ও আর আর ব্যাপারের উদয় হইল, তাহা কি বাক্যে প্রকাশ করিব স্থির করিতে পারিলাম না। কয়েক দিবস শ্বশুরসদনে অশেষবিধ আমোদ প্রমোদ করত আপনার স্ত্রীকে কহিলেন "যদি আমার বাবা কিংবা দাদারা তোমাকে নিতে আসেন, তবে তুমি কোন মতেই সেখানে যেও না" এবং শ্বশুরকে কহিলেন "মহাশয়! আপনার কন্যাকে আমাদিগের বাটীতে কখনই পাঠাইয়া দিবেন না, যদবধি আমি অর্থ আনিয়া স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র স্থানে একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিতে না পারি, তদবধি এইখানেই রাখিবেন।" এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া তিনি তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, তিনি ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাঢ্য ও মান্যবর শ্রোত্রিয় পালধিবংশ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (যাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট অদ্যাবধি ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে শোভা করিতেছে) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অতিশয় কাতরতা সহকারে নিবেদন করিলেন "মহাশয়! আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, শরণাগত হইলাম, যে প্রকারে হউক, সদয় হইয়া আশ্রয় দিয়া আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবেক।" দেওয়ানজী ভারতের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াও পুরাতন ও বর্ত্তমান অবস্থা সকল জানিতে পারিয়া এবং স্তবে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আশ্বাসবাক্যে সাহস প্রদানপুরঃসর কহিলেন "তুমি অতি যোগ্য ও প্রধান বংশের মনুষ্য, তোমার উপকার করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ভাল, তুমি এখানে থাকিয়া কিছু দিন অপেক্ষা কর, আমি বিহিত চেষ্টায় রহিলাম, সুযোগ-যুক্ত সময় পাইলে ও কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তোমার মঙ্গল সাধনে সাধ্যের ত্রুটি করিব না।" এতদ্রূপ

করুণাকর অনুকূল বচনে ভারতচন্দ্রের "মানস মুকুল" আনন্দমকরন্দভরে প্রফুল্ল হইল।—তৎকালে উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের জাতিসম্বন্ধীয় কোনরূপ অপবাদ থাকাতে তিনি তাঁহার বাসায় অবস্থান না করিয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান গোন্দালপাড়ানিবাসী ৺রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে থাকিয়া আহারাদি করিতে লাগিলেন, প্রতি দিবস প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে চৌধুরীবাবুর নিকট আসিয়া "উমেদারি" অর্থাৎ উপাসনা করেন। এই উপাসনা এবং সদগুণ জন্য উক্ত আশ্রিত জনের প্রতি আশ্রয়দাতার ক্রমশই স্নেহের আধিক্য হইতে লাগিল। কোন এক সময়বিশেষে কথোপকথন করিতে চৌধুরী কহিলেন "ভারত! আমি তোমাকে ফরাসির ঘরে এখনি একটা কর্ম্ম কবিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তোমার কিছুমাত্র সুখোদয় হইবে না, কারণ গুণেব গৌরব গোপন থাকিবে। আমি তোমার নিমিত্ত একটা প্রধান উপায় স্থিব করিয়াছি, নবদ্বীপের অধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, তিনি দুই চারি লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবাব নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিয়া থাকেন, তিনি এবারে যখন আসিবেন, তখন আমি তোমাকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়া দিব, তুমি যেমন গুণী ব্যক্তি, তিনি সেইরূপ গুণগ্রাহক, সেই স্থান তোমার পক্ষে যথার্থরূপ উপযুক্ত স্থান বটে।" এই বচনে ভারতচন্দ্র বারিদ-বদন-বিনির্গত বারিবিন্দুপতন-প্রত্যাশী চাতকের ন্যায় মহারাজের আগমনের প্রতি প্রতীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এক দিবস প্রাতে তিনি চৌধুরীর সভায় বসিয়া আছেন, এমত কালে দৈবাৎ প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তথায় শুভাগমন করিলেন। চৌধুরী মহাশয় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথা াগ্য সম্মান সহযোগে রাজাকে আসনারূঢ় করত অশেষ প্রকার সদালাপ সমাপনান্তর কহিলেন "মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে, এই ভারতচন্দ্র আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি, ইনি অমুক অমুকের সন্তান, সংস্কৃত জানেন, পারস্য জানেন, কবিতাশক্তি ভাল আছে, অধুনা দীনাবস্থায় অতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন, যাহাতে প্রতি-পালিত হয়েন এমত অনুগ্রহ বিতবণ করিতে আজ্ঞা হউক।"—মহারাজ তাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়া কহিলেন "আমি এইক্ষণে কলিকাতায় চলিলাম, কালী দর্শন করিয়া কালীঘাট হইতে কৃষ্ণনগর রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে ইনি যেন তথায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে গমন করিলে পর ভারতচন্দ্র তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া পরিতুষ্ট

হইয়া ৪০ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করত বাসা প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন "তুমি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা।"—তিনি তদনুসারে তন্নগরে থাকিয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হন, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান, নবদ্বীপাধিপতি প্রফুল্লিত হইয়া কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করত আজ্ঞা করিলেন "ভারত! তোমার প্রণীত কবিতায় আমার মনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না।" ভারত বলিলেন "মহারাজ! কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন।" রাজা কহিলেন "মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত ছিলেন,) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষা কবিতায় "চণ্ডী" রচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতিক্রমে "অন্নদামঙ্গল" পুস্তক প্রস্তুত কর।" সেই আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক কবিকেশরী অন্নদামঙ্গল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়া তৎসমুদয় লিখিতে লাগিলেন, এবং নীলমণি সমাদার নামক একজন গায়ক সেই সকল "পালা" ভুক্ত গীতের সুর, রাগ এবং পাঁচালী শিক্ষা করিয়া প্রতিদিন গান করিতে লাগিলেন। রচনা সমাধার পূর্ব্বে রাজা তদ্দৃষ্টে অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ-পরবশ হইয়া কহিলেন "বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করত ইহার সহিত সংযোগ করিতে হইবে।" পরে তিনি অতি কৌশলে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে আহ্লাদ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। ঐ অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরের গুণের ব্যাখ্যা আমি কি করিব? তাহার উপমার স্থল নাই বলিলেই হয়, এই ভারতে ভারতের ভারতীর ন্যায় ভারতের ভারতী সমাদৃত ও প্রচলিত হইয়াছে।—এই চারু গ্রন্থের পর "রসমঞ্জরী" রচনা করেন, তাহাও সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ও ভবানন্দ মজুমদারের পালা এ তিন একই পুস্তক, কেবল রসমঞ্জরীখানি স্বতন্ত্র।

পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বগুণে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র নৃপেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অতিশয় প্রিয় সভাসদ্‌রূপে গণ্য হইলেন। এই ভাবে কিছু দিন গত হইতে হইতে রাজা এক দিবস জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে রহিয়াছ, তোমার পরিবার কোথায়? তুমি বাটীর তত্ত্বাবধারণ কর কি না?" ভারত কহিলেন, "আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরালয়ে আছেন, ভ্রাতাদিগের সহিত

আমার তাদৃশ সম্ভাব নাই, এজন্য বাটী যাইবার অভিলাষ নাই, গঙ্গাতীরে কিঞ্চিৎ স্থান পাইলে স্বতন্ত্র একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তথায় পরিবার লইয়া স্বচ্ছন্দে বাস ও সংসারধর্ম্ম করিতে পারি।" রাজা কহিলেন "নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আমার অধিকার মধ্যে কোন্ স্থানে তোমার বাস করিতে ইচ্ছা হয়? কবি কহিলেন "ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় আমি কল্পতরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তাঁহার বাটীর নিকটে হইলেই ভাল হয়, যেহেতু তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ করিতে পারি।" রাজা কহিলেন "তবে তুমি "মূলাযোড়ে" গিয়া বসতি কর।" ভারত কহিলেন "যে আজ্ঞা মহারাজ, ঐ স্থানটিই আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে। পরে উল্লেখিত পণ্ডিত ও কবিপ্রতিপালক বিদ্যানুরাগী নরবর নৃপবর ভারতকে বাটীর নিমিত্ত ১০০ এক শত টাকা এবং ৬০০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্দেশপর্ব্বক মূলাযোড-খানি ইজারা দিলেন।

ভারত সেই টাকা ইজারার এবং সনন্দ লইয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া ভার্য্যাকে মূলাযোডে আনয়ন করত প্রথমে তথাকার ঘোষাল মহাশয়দিগের ভবনে একটি ঘর লইয়া কিছু দিন তাহারি মধ্যে বাস করিলেন, পরে নূতন নিকেতন নির্ম্মাণপূর্ব্বক যথারীতিক্রমে অনুষ্ঠান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।— তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পুত্রগণকে কহিলেন "ভারত মূলাযোডে গঙ্গাতীরে বাড়ী করিয়াছে, আমার প্রাচীন শরীর, এই বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাহীন দেশে বাস করা কর্ত্তব্য হয় না।" এই বলিয়া তিনি মূলাযোড়ে আগমন করিলেন, এবং এখানে স্বল্প কাল বাস করিয়াই তিনি লোকান্তরিত হইলেন। পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে রায় গুণাকর পুনর্ব্বার কৃষ্ণনগরে গিয়া কিয়ৎকাল বাস কবত···বসন্ত ও বর্ষা বর্ণনা এবং আব আর কবিতা রচনা কবেন।

এই সময়ে ভারত কখনো কৃষ্ণনগরে থাকেন, কখনো বাটী আসেন এবং কখনো কখনো ফরাসডাঙ্গায় গিয়া ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎ করত তথায় দুই চাবি দিবস বাস করেন। এমত কালে রাঢ় দেশে "বর্গির" হেঙ্গামা অতিশয় প্রবল হওয়াতে বর্দ্ধমানের অধীশ্বর মহারাজ তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের গর্ভধারিণী পুত্র লইয়া বর্দ্ধমান হইতে পলায়নপূর্ব্বক মূলাযোড়ের পূর্ব্ব দক্ষিণ "কাউগাছী" নামক স্থানে আসিয়া দোহারা গডবন্দী বাটী নির্ম্মাণ

করত তন্মধ্যে বাস করিলেন।—সেই বাটী এইক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে, কেবল কতকগুলিন ইষ্টক ও দুই একটা স্তম্ভ মাত্র চিহ্নস্বরূপ রহিয়াছে। গড় অদ্যাপি আছে, তাহার ভিতর অনেক বন্য পশু বাস করিয়া থাকে।…

ঐ কাউগাছীর রাজভবনে মহারাজা তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের শুভ বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহপূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয়। ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সেই মাঙ্গলিক কর্ম্মের অধ্যক্ষ হইয়া বিশেষরূপে নৃত্যগীতে সভার শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে ফরাসডাঙ্গা হইতে ৫০০ সৈন্য আসিয়া কয়েক দিবস রাজপুর ও দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল।

মহারাজ্ঞী দেখিলেন, ভারতচন্দ্র রায় মূলাযোড় ইজারা লইয়াছেন, ইনি ব্রাহ্মণ, আমার হস্তী, গো, অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদি গ্রামের ভিতর গিয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করিলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হইবেক, অতএব মূলাযোড গ্রামখানি আমার পত্তনি লওয়াই কর্ত্তব্য হইতেছে, এরূপ ধার্য্য করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র লিখিলেন। নবদ্বীপনাথ তৎপ্রদানে স্বীকৃত হইলে রাণী আপন কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে পত্তনি হইলেন।

ভারতচন্দ্র এই পত্তনির ব্যাপার অবগত হইয়া কৃষ্ণনগব-রাজের নিকট অনেক আপত্তি উপস্থিত করিলেন, রাজা কহিলেন "বর্দ্ধমানেশ্বর যখন আমার অধিকারে বাস কবিলেন, তখন আমার কত আহ্লাদ বিবেচনা কর, এবং পত্তনির নিমিত্ত যখন রাণী স্বয়ং পত্র লিখিয়াছেন তখন তাঁহার সম্মান ও অনুরোধ রক্ষা করা অগ্রেই উচিত হইতেছে।" ভারত বলিলেন "এরূপ হইলে আমার এ গ্রামে বাস করা কর্ত্তব্য হয় না" রাজা তাঁহাকে কহিলেন "যদি মূলাযোড়ে থাকিতে নিতান্তই ইচ্ছা না হয়, তবে আনরপুরের অন্তঃপাতি "গুস্তে" নামক গ্রামে গিয়া বসতি কর।" এই বলিয়া তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত আনরপুরের গুস্তেবাসী মুখোপাধ্যায়দিগের বাটীর নিকট ১০৫/ বিঘা এবং মূলাযোডে ১৬/ বিঘা ভূমি এককালে স্বত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মত্ররূপে প্রদান করিলেন।

রায় গুণাকর এই নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া মূলাযোড় পরিত্যাগপূর্ব্বক গুস্তে গ্রামে গমন করণের উদ্যোগ করিলে গ্রামস্থ সমস্ত লোক বিস্তর অনুরোধ করিয়া কহিলেন—"মহাশয়, কোন মতেই আমারদিগ্যে [illegible] পারিবেন না, আপনি গমন করিলে মূলাযোড় অন্ধকার [illegible]বে।" এই [illegible]রোধে বাধ্য হইয়া তিনি আনরপুরে গমন করিলেন না, মূল[illegible]তেই বাস করি[illegible]হিলেন।



রামদেব নাগ পত্তনিদার হইয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি ও আব আর লোকের উপর দৌরাত্ম্য কবাতে রায় কবিবর ক্রোধাধীন হইয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বপ্রকাশপূর্ব্বক কৌতুকচ্ছলে সংস্কৃত কবিতায় "নাগাষ্টক" রচনা করত পত্রযোগে কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করেন, মহাবাজ সেই পত্র এবং "নাগাষ্টক" পাঠ কবিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ভাবতেব বচনা-কৌশলের প্রতি অনুরাগপূর্ব্বক অনেক গুণ ব্যাখ্যা কবলেন, আর অনুবোধ দ্বাবা নাগেব দৌবাত্ম্য নিবাবণ করিয়া দিলেন। ····

কাব্যকর্ত্তা কবিকেশবী ভাবতচন্দ্র এইরূপ আমোদ আহ্লাদ, হাস্য কৌতুকে কয়েক বৎসব কাল হবণ কবত ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র-বোগে মানবলীলা সম্বরণপূর্ব্বক যোগ্য ধামে যাত্রা কবিলেন। প্রদীপ্ত প্রদীপ এককালেই নির্ব্বাণ হইল।—সকলে হাহাকাব কবিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ কহেন, তাঁহাব প্রথম বোগের সূত্র বহুমূত্র, কিন্তু তৎপবে ভগন্দর বোগ জন্মিয়াছিল।

ইনি ১৬৩৩ শকে, বাঙ্গালা ১১১৯ সালে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বাঙ্গালা ১১৬৭ সালে ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন। বর্ত্তমান ১২৬২ সাল পর্য্যন্ত তাঁহাব বৎসব গণনা কবিলে ১৪৩ বৎসব, এবং মৃত্যু বৎসব গণনা করিলে ৯৫ বৎসব হইবেক। আহা! কি পবিতাপ! এমত গুণশালী মহাত্মা মহোদয় ৪৮ বৎসবেব অধিক কাল এই বিশ্বধামে বিবাজ কবিতে পাবেন নাই। এই ৪৮ বৎসবেব মধ্যে বিংশতি বৎসর বাল্যলীলা এবং বিদ্যাভ্যাসে গত হয়, তাহাব পব দুই তিন ৎসর বর্দ্ধমানে বিষয়কর্ম্ম ও কাবাভোগ কবিয়া অনুমান ১৫।১৬ বৎসব উদাসীনেব বেশে নীলাচলে দেবদর্শন ও শাস্ত্রালোচনায় গত হইল,—তৎপবে এক বৎসব কাল শালীপতি ভ্রাতাব বাটীতে ও শ্বশুবালয়ে এবং ফবাসডাঙ্গায় ইন্দ্রনাবায়ণ চৌধুবীব নিকটে ক্ষয় কবত ৪০ বৎসব বয়সেব সময়ে নবদ্বীপেশ্বরের অধীন হইলেন, এবং সেই বর্ষেই "অন্নদামঙ্গল" এবং "বিদ্যাসুন্দর" রচনা কবিলেন। উক্ত সংযুক্ত গ্রন্থের বয়স ১০৩ বৎসর হইল, কাবণ তিনি ১৬৭৪ শকে, বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে বচনা করেন, অন্নদামঙ্গলে তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে, ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত, ভারত রচিলা॥"

এই প্রধান গ্রন্থের পরেই "রসমঞ্জরী" রচনা করেন, তাহাতেও অত্যাশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে,……

মরণের কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিক্রমে মহিষাসুরের যুদ্ধ বর্ণনাছলে সংস্কৃত ও হিন্দি-মিশ্রিত বঙ্গভাষায় "চণ্ডী নাটক" নামে এক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, তাহার ভূমিকা ও যুদ্ধের আড়ম্বর মাত্র প্ররচনা করিয়াই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন।……

ভারতচন্দ্র রায়ের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিত রায়, মধ্যম রামতনু রায় এবং কনিষ্ঠ ভগবান্ রায়, এইক্ষণে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশ নাই, মধ্যম রামতনু রায়ের পুত্র পূজ্যবর শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায় মহাশয় মূলাযোড়ে বাস করিতেছেন, ইনি অতি বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সদ্বিদ্বান্, এবং সুরসিক, অতিশয় প্রাচীন হইয়াছেন, উত্থানশক্তি নাই বলিলেই হয়, বয়স প্রায় ৮১ বৎসর গত হইয়াছে। এই মহাশয়ের অপার কৃপায় তাঁহার পিতামহ রায় গুণাকরের "জীবন-বৃত্তান্ত" প্রাপ্ত হইয়াছি। [শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী"—তে ভারতচন্দ্রের জীবনী প্রসঙ্গে গুপ্ত কবি লিখিত ভারতচন্দ্রের জীবনীই প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে এবং এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহৃত হইয়াছে]।

ভারতচন্দ্রের রচনাবলী

১। **সত্যপীরের পাঁচালী**। ১১৩৮ সন।

২। **রসমঞ্জরী**। মৈথিল কবি ভানুদত্তের রসমঞ্জরী গ্রন্থের অনুবাদ। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এবং কামসূত্রে নায়ক-নায়িকাদের যেসব লক্ষণাদির বর্ণনা আছে ভারতচন্দ্র তাহাই অনুসরণ করিয়া এই খুচরা কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন। এইগুলি ১১৩৮ হইতে ১১৪৯ সালের মধ্যে রচিত।

৩। **নাগাষ্টক**। কবি যখন মূলাজোড় গ্রামে বাস করিতেন তখন ঐ স্থানের জমিদার রামদেব নাগের অত্যাচারের প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া কবি সংস্কৃতে এই কাব্যখানি রচনা করেন। ১১৪৫-৫০ সন।……

৪। **অন্নদামঙ্গল**। তিন খণ্ড। ১১৫২-৫৩।

৫। **বিবিধ কবিতাবলী**। ৬। **গঙ্গাষ্টক**।

৭। **চণ্ডী নাটক**। বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দীর মিশ্রণে রচিত।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং অন্নদামঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দের পরিচয়

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যকে একচ্ছত্র শাসনাধীনে রাখিবার মত দক্ষ শাসনকর্তার একান্ত অভাব ঘটিল। কিছুদিনের মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। অতঃপর প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন এবং দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সমগ্র দেশে ঘোর অরাজকতা দেখা দিল, প্রত্যেকেই নিজের কোলে ঝোল টানিবার মনোভাব-দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিলেন। এই অরাজকতা এবং তজ্জনিত হানাহানির ঘটনা বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যাতেই সর্বাধিক ঘটিতে লাগিল।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। তখন বাংলাদেশের নবাব ছিলেন আলীবর্দী খাঁ। মুর্শিদাবাদের অদূরে নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত জমিদার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়াই ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য রচনা করেন। আলীবর্দী খাঁ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন এবং তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। সিরাজদ্দৌলা মাত্র এক বৎসর দুই মাস নবাবী করিতে সক্ষম হন। ভারতচন্দ্র বাংলাদেশের এক চরম যুগসন্ধিক্ষণের ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যে ঐসব ঘটনার প্রায় কোন ছায়াপাতই ঘটে নাই। তিনি ইতস্ততঃ কয়েকজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির নামোল্লেখ করা ছাড়া ইতিহাসকে মোটামুটি তাঁহার কাব্য হইতে নির্বাসন দিয়াছেন। তৎ-কর্তৃক উল্লিখিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের পরিচয় এই প্রসঙ্গে দেওয়া যাইতেছে।

মুর্শিদকুলি খাঁ—ঔরঙ্গজীব ১৭০৫ সালে ইঁহাকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ঢাকা হইতে বাংলাদেশের রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার নামানুসারেই উক্ত নগরীর নামকরণ হয়। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুজাউদ্দিন—মুর্শিদকুলি খাঁয়ের জামাতা। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের মৃত্যুর পর ইনি বাংলাদেশের শাসক হইয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হয়।

সরফরাজ খাঁ—সুজাউদ্দীনের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি বাংলাদেশের নবাবী প্রাপ্ত হন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি আলীবর্দী কর্তৃক নিহত হইলেন।

আলীবর্দী খাঁ—১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সরফরাজকে নিহত করিয়া ইনি বাংলার মসনদে আরোহণ করেন এবং ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মসনদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

আলমচন্দ্র রায়রায়ান—আলমচন্দ্র রায় ছিলেন সুজাউদ্দিনের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য। রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল বলিয়া ইঁহাকে রায়-ই-রায়ান (rajah of rajahs, রাজাদের রাজা) উপাধি দেওয়া হয়।

সৌলৎজঙ্গ—ইনি নবাব আলীবর্দী খাঁয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা। ইনি উড়িষ্যার শাসনকর্তা ছিলেন।

মুরাদবাখর—মুর্শিদকুলি খাঁয়ের জামাতা। ইনিই সৌলৎজঙ্গকে হটাইয়া দিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছিলেন। পরে আলীবর্দী খাঁয়ের নিকট ইঁহার পরাজয় ঘটে।

রঘুরাজ—রঘুজী ভোঁসলে বা রঘুরাজ মহারাষ্ট্রের অন্যতম নেতা। বাংলাদেশে চৌথপ্রথা চালু করিবার জন্য ইনি ভাস্করপন্থ বা ভাস্করপণ্ডিতকে বাংলাদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ভাস্করপণ্ডিত—আলীবর্দী যখন উড়িষ্যায় মুরাদবাখরকে দমন করিতে যান তখন ভাস্কর বাংলাদেশ আক্রমণ করেন এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করেন। আলীবর্দী প্রথমে একবার তাঁহাকে বিতাড়িত করেন। ভাস্কর আবার বাংলায় আসিলে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আলীবর্দী কর্তৃক নিহত হন।

সুজন—ইনি আলীবর্দীর রাজস্ববিভাগের একজন বড় কর্মচারী ছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—১৭১০ খৃষ্টাব্দে ইনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। নবাব আলীবর্দীর ইনি প্রিয়পাত্র ছিলেন কিন্তু ইনিই সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত কূট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর এলাকার তিনিই ছিলেন যথার্থ রাজা যদিও আসলে মুর্শিদাবাদের নবাবদের অধীনে তিনি একজন ভূস্বামী ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র খুবই বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সভায় ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জ্যোতির্বিদ অনুকূল বাচস্পতি, সুরসিক গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি নানাগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

অন্নদামঙ্গল

(সংক্ষিপ্ত কাহিনী)

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—(১) অন্নদামঙ্গল (২) বিদ্যা-সুন্দর (৩) ভবানন্দ মজুমদারের পালা। তিনখণ্ডে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন যোগসূত্র নাই। বর্তমান গ্রন্থে আলোচ্য বিষয় হইতেছে এই সুবৃহৎ কাব্যের প্রথম খণ্ড অন্নদামঙ্গল।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে মোট ছিয়ানব্বইটি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলি সমগ্র কাব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। অর্থাৎ এই গুলিকে একক হিসাবে না দেখিয়া সমগ্র কাব্যেব অন্তর্গত অংশ হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে যদিও একক হিসাবে ইহাদের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা। অন্নদামঙ্গল বচিত হওয়ার কারণ বর্ণনা কবিতে গিয়া গুপ্তকবি তাঁহাব ভারতচন্দ্রেব জীবনবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "ভাবতচন্দ্র প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে বাজসভায় উপস্থিত হন, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান, নবদ্বীপাধিপতি প্রফুল্লিত হইয়া কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকব' উপাধি প্রদান কবত আজ্ঞা করিলেন, 'ভারত! তোমার প্রণীত কবিতায় আমাব মনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা কবি না।' ভাবতচন্দ্র কহিলেন, 'মহারাজ! কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন।' র া কহিলেন, 'মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত ছিলেন,) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষা-কবিতায় 'চণ্ডী' বচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতি ক্রমে 'অন্নদামঙ্গল' পুস্তক প্রস্তুত কর।' সেই আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক কবিকেশরী অন্নদামঙ্গল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।"

কাব্যের সূচনায় প্রথম আটটি কবিতাতে মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক রীতি অনুসারে ভারতচন্দ্রও বিভিন্ন দেবদেবীর—গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু প্রভৃতির বন্দনা করিয়াছেন। অতঃপর গ্রন্থসূচনা। মঙ্গলকাব্যের কবিরা যেমন গ্রন্থ লিখিবার একটি অলৌকিক কারণ দর্শাইয়া থাকেন ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। কাব্য-রচনার কারণ-স্বরূপ ভারতচন্দ্র বলিতেছেন যে, বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ একদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের

(নবদ্বীপাধিপতি) নিকট বার লক্ষ টাকা নজরানা দাবী করেন। অল্প সময়ের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে অক্ষম হওয়ায় নবাব মহারাজাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া কারাগারে অবরুদ্ধ করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর পরমভক্ত রাজা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তের বিপদে দেবী স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বপ্নে—

অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া ॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয় ॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস ॥

দেবী রাজাকে স্বপ্নে আরও বলিয়া দিলেন,

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায় ॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও ॥
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে।
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে ॥

এই আজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। কবিবর ভারতচন্দ্রও জগজ্জননীর স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য করিয়া—

সেই আজ্ঞা মত করি রায়গুণাকর ।
~~সেই মত আজ্ঞা করি রায় গুণাকর।~~
অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতর ।।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতচন্দ্র যে-কাব্য রচনা করিলেন তাহা 'নবরসতর।' যদিও ভারতচন্দ্র গতানুগতিক মঙ্গল কাব্য-ধারার কবি তবুও এই নবরসের সৃষ্টির জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছেন।

অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন। ভারতচন্দ্রের কাল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক চরম সন্ধিক্ষণ। আমরা আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করি যে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই যুগসন্ধিক্ষণের বিশেষ কোন ছায়াপাত ঘটে নাই। তাঁহার কাব্যের ইতস্ততঃ কিছু কিছু সাময়িক ঘটনার স্পর্শ থাকিলেও দুর্যোগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন

সেই যুগের কোন স্পষ্ট ছবি ভারতচন্দ্র অঙ্কন করেন নাই। তবে 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন' অংশটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটিয়াছিল ভারতচন্দ্র তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই অংশটি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কালঙ্কার, কবি রাজকিশোর, সভাসদ কালিদাস সিদ্ধান্ত, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ অনুকূল বাচস্পতি, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ বিশ্রাম খাঁ, যোদ্ধা ভগবন্ত সিংহ, নর্তক শের মামুদ প্রভৃতি ব্যক্তিদেব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয় পবিজনেব এক বিস্তৃত তালিকা এই অংশে প্রদত্ত হইয়াছে। আব হইয়াছে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যেব সীমানা বর্ণনা :—

অধিকার বাজার চৌবাশী পবগণা।
খাড়ি জুড়ী আদি কবি দপ্তবে গণনা॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীবথী খাদ॥
দক্ষিণেব সীমা গঙ্গাসাগবের ধার।
পূর্ব্বসীমা ধুল্যাপুব বড় গাঙ্গ পার॥

কাব্যের সূচনায় লিখিত এই দশটি কবিতাকে আমরা কাব্যের ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ কবিতে পাবি। একাদশ কাহিনী হইতেই কাব্যেব মূল কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে। এই মূল কাহিনীটি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে (একাদশ কবিতা হইতে পঞ্চসপ্ততিতম কবিতা পর্যন্ত) হর-পার্ব্বতীব লীলা এবং কাশীধামেব সৃষ্টি ও উহাব মাহাত্ম্য, দ্বিতীয় ভাগে (ত্রিনবতিতম কবিতা পর্যন্ত) হরিহোড়ের বৃত্তান্ত এবং ভবানন্দ মজুমদাবের (মহাবাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ) কাহিনীর সূচনা করা হইয়াছে।

ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে বাংলা মঙ্গলকাব্যে অনুসৃত হর-পার্বতীর চিত্রই প্রকারান্তরে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রেব সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি হর-পার্বতীর চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া বিভিন্ন পুরাণাদি এবং শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আবশ্যকমত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। অন্নদার কাহিনীর সূত্রপাতে (একাদশ কবিতায়) কবি বলিয়াছেন যে, বিশ্বসৃষ্টির মূল শক্তি হইতেছেন দেবী অন্নপূর্ণা। তাঁহার মহিমা অনির্বচনীয়। তিনি—

অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি॥

কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি ॥

দেবী অন্নপূর্ণা পরমা প্রকৃতি। যখন চন্দ্র-সূর্যাদির সৃষ্টি হয় নাই, মহাশূন্য ঘনতমসায় আচ্ছন্ন তখন দেবী নিজদেহের জ্যোতিদ্বারা অন্ধকার দূরীভূত করেন। অতঃপর কারণ-সলিল সৃজন করিয়া বিনাগর্ভে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের জন্ম দেন। জন্মগ্রহণের পরই এই তিন দেবতা সলিলের উপর বসিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তখন মহামায়া—

তিনের জানিতে সত্ত্ব জানাইতে নিজ তত্ত্ব
শবরূপা হইলা কপটে।

সেই দুর্গন্ধযুক্ত শব ভাসিতে ভাসিতে বিষ্ণুর নিকটে গেলে বিষ্ণু ঘৃণাভরে দূরে সরিয়া যান। ব্রহ্মাও ঘৃণাভরে বার বার চারিদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন। ফলে চতুর্মুখ হইয়া যান। শিব ঐ শবকে আসনরূপে গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। শিবের মাহাত্ম্যে দেবী মুগ্ধা হইয়া তাঁহার ভার্যা হইলেন এবং দুজনের রতিক্রীড়ার ফলে বিশ্বসৃষ্টি হইল।

তারপরেই দেখা যাইতেছে ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষমুনির পত্নী প্রসূতির গর্ভে সতীরূপে মহামায়া জন্মগ্রহণ করেন। নারদমুনির ঘটকালিতে শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহ হয়। শিব সর্বদাই কিম্ভূত সাজে যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ান দেখিয়া দক্ষমুনি তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন। যখন তখন তিনি জামাতা শিবকে কটুবাক্য বলেন। শিব ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া ঘরণী সতীকে লইয়া কৈলাসপর্বতে চলিয়া যান এবং সেইখানেই দাম্পত্যজীবন যাপন করিতে থাকেন।

কিছুদিন পর খবর পাওয়া গেল যে, দক্ষমুনি এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। সেই যজ্ঞে সমস্ত দেবতারাই আমন্ত্রিত হইয়াছেন কিন্তু দক্ষ শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সতী নারদের মুখে যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা শুনিয়া পিতৃগৃহে যাইতে অভিলাষিণী হইলেন। শিব বিনা-নিমন্ত্রণে সতীকে তথায় যাইতে দিতে সম্মত হইলেন না। তখন:—

সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥

ক্রমে ক্রমে মহামায়া দশমহাবিদ্যারূপে অর্থাৎ কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী এবং মহালক্ষ্মীরূপে শিবের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। মহামায়ার এইরূপ রূপাদি দর্শনে শিব পরম বিস্মিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, এবং দেবীর ইচ্ছায় বাধা দিতে আর সাহস করিলেন না।

সতীদেবী অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে পিতৃভবনে আসিলেন, তাঁহার বেশ মলিন এবং বদন বিশুষ্ক, দেখিলেই মনে হয় যেন স্বামিগৃহে তিনি অত্যন্ত দুঃখে দিন কাটান। তাঁহাকে দেখিয়াই সমবেত দেবমণ্ডলীর সম্মুখেই দক্ষ শিব-নিন্দা করিতে লাগিলেন। ভারতচন্দ্র স্তুতির ছলে শিব-নিন্দার এই বিবরণটি অতি চমৎকার করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দক্ষ সতীর প্রতি এতই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন যে, তিনি নিজ কন্যাকে :—

মোর কন্যা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে
ছি ছি একি দশা তোর।
আমি মহারাজ তোর এই সাজ
মাথা খেতে আলি মোর॥
বিধবা যখন হহবি তখন
অন্ন বস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে
তার মুখ না দেখিব॥

পতি-নিন্দা শুনিয়া অভিমানিনী সতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং এইরূপ নিন্দার ফলে দক্ষের পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ হইবে ইহা পিতাকে জানাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিলেন। সতীর সঙ্গে নন্দীও দক্ষগৃহে আসিয়াছিল। সতীকে দেহত্যাগ করিতে দেখিয়া নন্দী দ্রুত কৈলাসে চলিয়া গেল। নন্দীর মুখে :—

শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর
বিস্তর কৈলা রোদন।
লয়ে নিজগণ করিলা গমন
করিতে দক্ষদমন॥

অতঃপর দক্ষযজ্ঞনাশ। এই যজ্ঞনাশের বিবরণ দিতে গিয়া ভারতচন্দ্র অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক প্রভৃতি

ছন্দ ব্যবহার করিয়া ক্রোধান্ধ শিবের রূপটি তিনি মনোজ্ঞভঙ্গীতে পরিবেশন করিয়াছেন। এই ছন্দের তালে তালে মনে হয় যেন উন্মত্ত ভূতদলের প্রচণ্ড পদক্ষেপ ধ্বনিত হইতেছে। যজ্ঞে সমবেত ব্যক্তিগণের দ্রুত পলায়ন এবং আর্তনাদের ফলে যে মহাগণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও যেন এই ছন্দের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দের মধ্যে কিরূপ দ্রুত তালের সঞ্চার হইয়াছে তাহা এই অংশটুকু হইতে বুঝা যাইবে :—

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চোদ্দ লোক কাঁপিছে॥

* * * *

রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গিয়া।
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধ রঙ্গ রঙ্গিয়া॥
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁপ ছিণ্ডিল।
পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল॥
বিপ্র সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কীল মারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্ত কেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে॥

শিব এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দের প্রচণ্ড তাণ্ডবে দক্ষমুনির বিরাট যজ্ঞভূমি শ্মশানে পরিণত হইল, দক্ষ নিজেও নিহত হইলেন। তখন দক্ষের পত্নী প্রসূতী নিদারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া শিবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। নিরপরাধা শ্বাশুড়ীর কাতর বিলাপধ্বনি শুনিয়া শিব অতিশয় লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি যখন বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন,

সতীর জননী আমি শ্বাশুড়ী তোমার।
তথাপি বিধবা দশা হইল আমার॥
ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি।
তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি॥
তোমার শাশুড়ী বলি মর নাহি লয়।
আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময়॥

তখন,

প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা।
রাজ্যসহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা ॥

কিন্তু তাহাতে এক করুণ অথচ কৌতুকাবহ ব্যাপারের সৃষ্টি হইল,

ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়।
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায় ॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ।
প্রসূতি বলিছে প্রভু এ কি বিড়ম্বন ॥

শিবের নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া সতী দক্ষকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, দক্ষের ছাগমুণ্ড হইবে। নন্দী তখন একটা ছাগল কাটিয়া আনিয়া দক্ষের ঘাড়ে বসাইয়া দিল। দক্ষ তখন সেই ছাগ-মুণ্ড দিয়া শিবের বিস্তর স্তুতি করিলেন।

এদিকে শিবের মনে কোন শান্তি নাই। তিনি সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে তুলিয়া সতীর গুণরাশি গাহিয়া গাহিয়া নানাস্থানে উন্মাদের মত ঘুরিতে থাকেন। সতীর মৃতদেহ তাঁহার স্কন্ধের উপর বিগলিত হইতে আরম্ভ করে। শিবের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তখন,

তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি।
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি ॥
যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর।
মহাপীঠ সেইস্থান পূজিত বিধির ॥

বিষ্ণুর চক্রদ্বারা সতীদেহ এইভাবে খণ্ডিত হইয়া একান্নটি স্থানে পতিত হইয়াছিল। সেই একান্নটি স্থান অবিলম্বে পুণ্য তীর্থপীঠে পরিণত হইল। 'পীঠমালা' কবিতায় ভারতচন্দ্র সেই একান্ন পীঠের কথা বলিয়াছেন। অতঃপর,

শূন্য শিব দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান।
হিমালয় পর্ব্বতে বসিলা করি ধ্যান ॥

সতীদেবীর বিলয় হইতে পারে না। তিনি গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে উমার যৌবন-সমাগম ঘটিলে দেবগণ শিবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়ার সঙ্কল্প করেন, শিব কিন্তু তখন কৈলাস-শিখরে গভীর ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। দেবতারা কিছুতেই তাঁহার ধ্যানমগ্ন অবস্থার ব্যত্যয় ঘটাইতে পারিলেন না। কালিদাসের কুমার-

সম্ভব কাব্যে "নিবাত নিষ্কম্প" মহাদেবের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে ভারতচন্দ্রের উপর তাহার প্রভাব এই স্থলে স্পষ্টতই লক্ষণীয়। শিবের নিকট হইতে কোন প্রকার সাড়া না পাইয়া দেবগণ,

মন্ত্রণা করিয়া মদনে ডাকিয়া
সুরপতি দিলা পান।
সম্মোহন বান করিয়া সন্ধান
শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান॥

মদনের সম্মোহন বাণে শিবের ধ্যানভঙ্গ হয় বটে কিন্তু ইহাতে তিনি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ফলে তাঁহার তৃতীয় লোচন অগ্নিসম তেজে জ্বলিয়া উঠে, মদন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়। কিন্তু মদনের বাণে শিবের সারা দেহে ও মনে প্রচণ্ড কামোত্তেজনা দেখা দেয়। তিনি আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া আশেপাশে যে সব অপ্সরা-কিন্নরী ছিল তাহাদের পশ্চাতে ছুটিতে থাকেন। একটু পূর্বেই ধ্যানমগ্ন শিবের যে মৌন-গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া আমরা সম্ভ্রমে মাথা নত করি তাঁহার এই কামোন্মত্ত বিচলিত ভাব দেখিয়া স্বভাবতই আমাদের মনে কৌতুকের সৃষ্টি হয়। কবিবর ভারতচন্দ্র যোগীশ্রেষ্ঠ শিবের নিদারুণ দুর্গতি ঘটাইয়াছেন,

মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া নারী তপসিয়া
ফিরেন সকল স্থানে॥
কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর
কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥

তখন দক্ষ আসিয়া সহাস্যে শিবকে নিবেদন করিল যে, সতী গিরিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে বিবাহ করিয়া শিব আনন্দে বিহার করুন। উতলা শিব কহিলেন, 'ওরে বাছাধন' শীঘ্র তার ব্যবস্থা কর। দেবগণের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, শিব-বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে থাকিল।

একদিকে মদনের মৃত্যুতে রতির বিলাপের অন্ত নাই। সে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল,

শিব শিব শিব নাম সবে বলে শিবধাম
বাম দেব আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে তার দৃষ্টে প্রভু মরে
এমন না দেখি কোন কালে॥
শিবের কপালে বয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে বহে আরের কপাল দহে
আগুনেব কপালে আগুন।

নিদারুণ শোক সহ্য করিতে না পাবিয়া একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া রতি তাহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে চাহিল। তখন আকাশে দৈববাণী হইল। সেই দৈববাণীতে মদনেব পুনরুজ্জীবনের নির্দেশ ব্যক্ত হইল। রতি শান্ত হইয়া আত্মহত্যাব সঙ্কল্প ত্যাগ কবিল।

উমার সঙ্গে শিবের পবিণয়েব দিন নির্দিষ্ট হইল। মহাদেব সঙ্গী-সাথী লইয়া হিমালয়গৃহে যাত্রা করিলেন। ববযাত্রীদেব মধ্যে দেবতা ও ভূত-প্রেত সকলই আছে। কিন্তু ভূত-প্রেতেব প্রমত্ত উল্লাসের ঠেলায় শেষ পর্যন্ত দেবতারা সরিয়া পড়িলেন। মহাদেবেব চেলা-চামুণ্ডা এই ভূত-প্রেতসমূহের উল্লাস বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন,—

ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ
লম্প ঝম্প দিয়া দিয়া চলে।
মহা ধুমধাম হাঁকে হুম হাম
জয় মহাদেব বলে॥
সহজে সবার বিকট আকার
সহিতে না পারে আলো।
থাবায় থাবায় মশাল নিবায়
আন্ধারে শোভিল ভালো॥
করতালি দিয়া বেড়ায় নাচিয়া
হাসে হিহি হিহি হিঁহিঁ।
দন্ত কড়মড়ি করে জড়াজড়ি
লক লক লক জিহি।

করে চড়াচড়ি ধায় রড়ারড়ি
কিলাকিলি গণ্ডগোল।
কে কারে আছাড়ে কে কাকে পাছাড়ে
কে মানে কাহার বোল॥
তরু উপাড়িয়া গিরি উখাড়িয়া
কৈল প্রলয়ের ঝড়।
বরযাত্রগণ লইয়া জীবন
পলাইল দিয়া রড়॥
ইন্দ্রাদি পলায় অন্য কেবা তায়
দেখিয়া আনন্দ হরে।
আগে ভাগে হরি বিধি সঙ্গে করি
গেল হেমন্তের ঘরে॥

বলদে চড়িয়া শিঙা ফুঁকিতে ফুঁকিতে আগত বরকে আসিতে দেখিয়া কন্যার বাড়ীর লোকেরা একেবারে হতবাক হইয়া গেল।

শুভ বিবাহানুষ্ঠান আরম্ভ হইল। সে বড় কৌতুককর দৃশ্য। পুরোহিত শিবকে পিতামাতার নাম জিজ্ঞাসা করেন, শিব কিছুই বলিতে পারেন না। যাহা হোক কোনক্রমে শুভকার্য সম্পন্ন হইল। এমন সময় কেশবের উস্কানীতে নারদ এক মহা কোন্দল বাধাইয়া তুলিল। শিবের অঙ্গ বাঘছালে আবৃত, কোমরে একটি সাপ কটিবন্ধের মত জড়াইয়া থাকিয়া ছালটিকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। এয়োগণসহ মেনকা বরণডালা লইয়া যেই মাত্র শিবের সম্মুখে আসিলেন তখনি নারদের ইঙ্গিতে গরুড় আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। গরুড়কে দেখিয়া শিবের অঙ্গে যে সব সাপ জড়াইয়া রহিয়াছিল তাহারা ভয়ে পলাইয়া গেল। ফলে শিবের দেহ হইতে বাঘছালটি খসিয়া পড়িল। তখন,

বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়োগণ বলে ও মা এ কেমন বর॥
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই॥

প্রদীপ নিভাইয়া দিলে কি হইবে। শিবের তৃতীয় নেত্র হইতে আলো বিচ্ছুরিত হইয়া সব কিছুকেই স্পষ্ট করিয়া তুলিল। নারদের মত বেহায়া বোধ হয় আর কেউ নাই। দন্তপঙক্তি বিকশিত করিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি কহিলেন,

শুন শুন এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও।
কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও ॥

কিন্তু মেনকা মহা চটিয়া গেলেন। একেতো এইরূপ জামাই, মাথায় জটার ভার, সর্বাঙ্গে ছাই মাখা, দুর্গন্ধে ভূত পালায়, তদুপরি বয়সেরও গাছ-পাথর নাই। কোমলাঙ্গী বালিকা গৌরী এই আকাট গোঁয়ারটার হাতে পড়িল ভাবিয়া তাঁহার দুঃখের সীমা নাই। আবার কিনা বুড়া হতভাগার এই নির্লজ্জ আচরণ? তিনি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন,

ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়।
হাত লাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয় ॥
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে ॥
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদার কথায় করিল হেন কাজ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু অপ্রাপ্তবয়স্কা পুষ্পকোমলা বালিকারা কৌলীন্যপ্রথার বলি হইয়া আজীবন বেদনার বহ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। রামপ্রসাদের গানে তাহাদের ব্যথাতুর জীবনের করুণ রাগিণী অতি মধুর স্বরে বাজিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কৌতুকরসের প্রাধান্য ঘটিলেও কারুণ্যের একেবারে অসদ্ভাব নাই। বরং কৌতুকের আবরণে কারুণ্য আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

উমার সঙ্গে তুলনায় শিবের হীনতা-সম্পর্কে সকলে আলোচনা করিতে লাগিল। সমবেত যুবতীরা কিন্তু কলহপর্বটিকে অন্য পর্যায়ে লইয়া আসিল। তদুপরি নারদের উস্কানিতো আছেই।

নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল ॥
এ বলে উহারে সই ওটা বড় ঠেঁটা।
আর জন বলে সই এই বটে সেটা ॥

যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা।
আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা॥
সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঢেঁটা।
গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা॥
তার সই বলে থাক জানি লো উহারে।
পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখিঠারে॥

এইরূপ ঝগড়াঝাঁটি দেখিয়া,

দাঁড়াইয়া পিঁডায় হাসেন পশুপতি।
হেঁটমুখে মৃদু মন্দ হাসেন পার্বতী॥

কিন্তু গিরিরাণী মেনকা তখন ডুকরাইয়া কাঁদিতেছেন। উমার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া তাঁহার মন কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না। তিনি ইনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করিতেছেন,

আহা মরি ও মা উমা সোনাব পুতুল।
বুডাবে কে বলে বব কেবল বাতুল॥
পায়ে পডে আমার উমাব কেশপাশ।
বুডার বিকট জটা পরশে আকাশ॥
আমার উমার দন্ত মুকুতাগঞ্জন।
বায়ে লডে ভাঙ্গা বেডা বুডাব দশন॥
উমাব বদনচাঁদে পরকাশে রাকা।
বুডার বিকট মুখে দাঁডি গোঁফ পাকা॥
কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন।
ছাই মাখে অঙ্গে বুডা এ কি অলক্ষণ॥
উমার গলায় জাতী মালতীর মালা।
বুডার গলায় হাডমালা একি জ্বালা॥
বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে।
বাঘছাল পরে বুডা আঁত উঠে গন্ধে॥

এই তো জামাইয়ের বেশবাস, চেহারা-ছবি। তার উপর জামাই কি রকম বেহায়া,

আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে।
কেমনে উলঙ্গ হইল শাশুড়ীর কাছে॥

শিব তখন মেনকার দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই দিব্যকান্তি মোহন বেশ দেখিয়া মেনকার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বিবাহ-বাসরে সমবেত নরনারীবৃন্দ সবিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং শিব,

উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।
বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস॥

কৈলাসে আসিয়া শিব নন্দীকে সিদ্ধি ঘুঁটিতে আদেশ দিলেন। সে এক বিরাট কাণ্ড। নন্দী নানাবিধ দ্রব্য সহযোগে বার লক্ষ মণ সিদ্ধি ঘুঁটিল। সেই সিদ্ধি ভক্ষণ করিয়া শিব মধুর নেশায় ঢুলিতে লাগিলেন। অতঃপর নববিবাহিতা দম্পতীর কথোপকথন সুরু হইল। পার্বতীই যে বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত কারণ, তিনিই যে মূল প্রকৃতি শঙ্কর তাহা অবগত আছেন। তাই তিনি দেবীর কাছে প্রার্থনা করিলেন,

অর্দ্ধ অঙ্গ তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে।
হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥

দেবী শঙ্করের স্বভাব ভাল করিয়াই অবগত আছেন। তিনি সহাস্যে শঙ্করকে খোঁচা দিয়া কহিলেন,

হাসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে।
তার সাক্ষী মৃত পতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥
অর্দ্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

শিব ভীষণ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন বলিলেন যে, এমন আচরণ তিনি কখনই করিতে পারেন না। সতীর দেহত্যাগের পর তিনি কিভাবে সতী-অঙ্গ স্কন্ধে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন শিব সেই বিবরণ দিলেন। গৌরী খুসী হইলেন এবং অতঃপর সানুরাগে হর-গৌরী মিলন সাধিত হইল।

কৈলাসধাম হইল শিবপুরী। ভারতচন্দ্র এই কৈলাস-বর্ণনে অপূর্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন:

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস॥
… … …
তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত॥

পরম রমণীয় কৈলাসপতি হইয়াও কিন্তু শিবকে ভিক্ষা করিতে হয় এবং এই প্রসঙ্গেই একদিন গৌরীর সঙ্গে মহা কোন্দল বাধিয়া গেল। শিব নিত্য নিত্য ভিক্ষা করেন, নানা দ্রব্যাদিও আনেন কিন্তু উদর-পূর্তি করিয়া একদিনও খাইতে পান না। মনের খেদে একদিন তিনি বলিয়া ফেলিলেন,

আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারী॥

শিব আরও বলিলেন যে,

বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর।
খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর।
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা॥

শিবের খেদ মিটিতে চায় না। তিনি বলিয়াই চলিলেন,

পরম্পরা পরম্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র॥

ব্যস্ আর যায় কোথায়? গৌরী একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি এই ভিখারীর সংসার কত কষ্টে যে চালাইতেছেন তাহা একমাত্র বিধিই জানেন। তার জন্য তো কোন কৃতজ্ঞতা বোধ তো নাইই উপরন্তু ঠেস্ দিয়া কথা? গৌরী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। শিবের যে কি সম্বল আছে তাহা কে না জানে। একটা বুড়া বলদ ছাড়া আর কি আছে? গৌরীকে তিনি অলক্ষণা বলেন? নিজের তো এই রূপ, বয়সেব গাছ-পাথর নাই তবে কোন লজ্জায় অপরের ত্রুটি ধরেন। উহাব লজ্জা বলিয়া যদি কিছু পদার্থ থাকিত তবে এই কথা কখনো বলিতে পারিতেন না যে, তাঁহার কপালগুণে পুত্র হইয়াছে কিন্তু গৌরী পোড়াকপালী বলিয়া ধন হয় নাই। গৌরীব ইচ্ছা ছিল না এইসব কথা বলিবার। কিন্তু লোকে আব কত সহ্য করিতে পারে। গৌরী অলক্ষণা? বটে?

অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোব আসিবার পূর্বকালি ধন কই॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তবে কত ধন লয়ে॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥
তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥

খুব যে পুত্রভাগ্যের গর্ব করা হয়। কিন্তু পুত্রেরা যে কি পদার্থ কাহাকে গৌরী বলিবেন,

বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি ক্ষুদ কোণ যে প. ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর॥
ছোট পুত্র কার্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়॥

উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে ॥

এইরূপে হর-পার্বতীর কলহ চরমে পৌঁছিল। এই কলহে তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজজীবনের ছায়াপাত অতি সুস্পষ্ট। নিষ্কর্মা উদাসীন প্রকৃতির স্বামী আর অভাবে জর্জরিতা স্ত্রী। তদুপরি বাউণ্ডুলে প্রকৃতির কতকগুলি ছেলেপিলে। একবেলা আহার জুটে তো আরেক বেলা জুটে না। বাঙ্গালীর সংসারের এই চিত্র আজকের দিনেও বিরল নয়।

লজ্জা ও ক্ষোভে শিব মরিয়া গেলেন। সংসারের প্রতি তাঁহার নিদারুণ বীতশ্রদ্ধা আসিয়া গেল। তিনি ভিক্ষায় বাহির হইলেন,

ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহার উচিত বনবাস ॥

কিন্তু কিই বা শিব করিতে পারেন। তাঁহার তো ভিক্ষা করা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই,

বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নিগুর্ণ কয় ভুলায়ে সর্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার ॥
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিলা বৃষবর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥

পার্বতীও 'যে ঘরে গৃহস্থ হেন' সেই ঘরে আর থাকিবেন না বলিয়া মনস্থ করিলেন। তিনি কার্তিক ও গণেশকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় সখী জয়া অভয়াকে উপদেশ দিলেন যে, এমন করিয়া পিতৃগৃহে যাওয়া ঠিক হইবে না, কারণ বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে আদর পায় না। বাপ-মা কয়েক দিন

আদর করেন বটে কিন্তু তারপরেই বিরসবদন হইয়া যান। ভাজ (ভ্রাতৃবধূ) সর্বদাই কটু কথা কহে,

জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া॥

কাজেই জয়ার উপদেশ এই যে, দেবী **অন্নপূর্ণারূপে** প্রকাশিত হোন। তাঁহাকে তখন,

তিন ভূমণ্ডলে পূজিবে সকলে
চৈত্র শুক্লা অষ্টমীতে।
দ্বিতীয়া অন্বিত অষ্টাহ সঙ্গীত
বিসর্জ্জন নবমীতে॥

দেবী অন্নপূর্ণা মূর্তি ধারণ করিলেন এবং শিবকে জব্দ করিবার জন্য বিশ্বের সকল অন্ন হরণ করিয়া লইয়া আসিলেন।

এদিকে,

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেণ অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥

কোথায়ও অন্ন না পাইয়া শিব শেষ পর্যন্ত,

ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মী নারায়ণ॥
আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর।
ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁপর॥

লক্ষ্মী শিবকে অন্নপূর্ণার কাছে যাইতে উপদেশ দিলেন। ঘরে যাঁর জগৎপালিনী অন্নপূর্ণা পত্নীরূপে অধিষ্ঠিতা তিনি কেন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। শিব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অন্নপূর্ণা শিবকে ষোড়শোপচারে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন। আশুতোষের ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত হইল। তিনি অন্নদার গুণগানে রত হইলেন। কবি বলিতেছেন অন্নপূর্ণা স্বয়ং প্রকৃতিস্বরূপা। তিনি আদ্যাশক্তি,

শিবের শিবত্ব যার উপাসনা ফলে।
নিগম আগমে যারে আদ্যাশক্তি বলে॥
দয়া কর দয়াময়ী দানবদমনী।
দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দারিদ্র্যদলনী॥
হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্বজননী।
হেমহীরাহারময়ী হিরণ্যবরণী॥

দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় এবং শক্তিতে বিমোহিত হইয়া শিব মর্ত্যলোকে দেবীর পূজাপ্রচারের উদ্যোগ করিলেন। তিনি বিশ্বকর্মাকে পুণ্য কাশী-ধামে অন্নপূর্ণা পুরী নির্মাণ করিয়া তথায় একটি স্বর্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্মা এক অপরূপ পুরী নির্মাণ করিল। তাহাতে বাড়ীঘর, জলাশয়, মৎস্যাদি, পশু-পক্ষী এবং নানা প্রকার বৃক্ষরাজি কিছুরই অপূরণ রহিল না। শিব অতঃপর অন্নপূর্ণা-পূজার আয়োজন করিলেন। স্বর্গের সমস্ত দেববৃন্দ নিমন্ত্রিত হইলেন। দেবতারা পরম কুতূহলে,

চল কাশী মাঝে সবে যাব।
অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব।

শিব পুরী প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থির করিলেন,

করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা।
তাঁর অধিষ্ঠান হয় তবে ত মহিমা॥
এত বলি মহাদেব আরম্ভিলা তপ।
কৈলা পুরশ্চরণ কতেক কত জপ॥

শিব পঞ্চতপ হইয়া অন্নপূর্ণার তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণও তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। সকলের সমবেত তপস্যায় প্রীত হইয়া,

অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে।
প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে॥

এই অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভা তেমন স্ফূর্তি লাভ করে নাই। হর-গৌরীর যে জীবন্ত চিত্রটি তিনি এতক্ষণ ধরিয়া কাব্যে ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন তাহা এই অংশে অত্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। ভারতচন্দ্র বোধ হয় এই সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি "কতেক

কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ" এই বলিয়া দায় সারিয়াছেন। (স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ড অধ্যায়)।

এদিকে পুণ্য কাশীধামে হর-গৌরীর এই প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখিয়া বিষ্ণুভক্ত ব্যাসমুনি ঈর্ষাকাতর হইয়া কাশীর পথে পথে যত্র তত্র শিবনিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শিব তাহাতে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং ব্যাসকে কাশী হইতে তাড়াইয়া দেন। ব্যাসও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি দ্বিতীয় কাশীধাম (ব্যাসকাশী) নির্মাণ করিয়া তথায় দেবী অন্নদাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি ধ্যানে বসিলেন। ব্যাসের এই ঈর্ষাপরায়ণ মনোবৃত্তিতে অন্নপূর্ণা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন এবং এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে (জরতীর বেশে) ব্যাসকে ছলনা করিয়া তাঁহাব সাধনা ব্যর্থ করিয়া দেন। অন্নদা জরতীবেশে ব্যাসকে যেভাবে ছলনা করিলেন তাহা ভাবতচন্দ্র জীবন্ত করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অন্নদা জরতীর বেশে ধ্যানমগ্ন ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। জরতীর বেশধারিণী অন্নদার রূপটি ভারতচন্দ্র এইভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,

কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া ঝুপড়ী লড়ি আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কান ঢেকে যায়।
কুঁজভরে পিঠভাঁড়া ভূমিতে লটায়॥

বুড়ী বারে বারে নানাকথা বলিয়া ব্যাসদেবকে বিরক্ত করিতে থাকেন। বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকায় ব্যাসদেব মহা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বুড়ী ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করে যে, ব্যাস-নির্মিত কাশীতে মরিলে তার গতি

কি হয়। ব্যাস জবাব দেন যে, ব্যাস-কাশীতে মরিলে তৎক্ষণাৎ জীবের মোক্ষলাভ হয়। বুড়ী যেন শুনিতে পায় নাই এইরূপ ভাণ করিয়া বারে বারে একই কথা জিজ্ঞাসা করে। ব্যাস দেখিলেন এতো বড় ভাল আপদ,

এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত ॥
দৈবদোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কানের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে ॥

আর যায় কোথায়? দেবীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া গেল। ব্যাসের কথা শুনিয়া দেবী,

বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কান।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আন্ধার দেখিলা।
হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা ॥

অবশ্য অতঃপর ব্যাসের বিলাপে দেবীর দয়া হইল। ব্যাস পার পাইয়া গেলেন।

অতঃপর দেবী মর্ত্যে পূজা-প্রচারে মনস্থ করিলেন। কিভাবে পূজা প্রচার করা যায় তৎসম্পর্কে জয়া ও বিজয়া এই দুই সখীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেবীকে পরামর্শ দিলেন যে, ধনীশ্রেষ্ঠ কুবের দেবীর পূজা করে। কুবেরের বসুন্ধর নামে এক অনুচর আছে। কুবের তাহাকে দেবীর পূজার পুষ্পচয়নের ভার দিবেন। কিন্তু বসুন্ধর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবহেলা দেখাইবে। তখন তাহাকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্যে দরিদ্র মানুষরূপে প্রেরণ করিতে হইবে। অতঃপর,

মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে।
ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে ॥
তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার।
কুবেরের সুতে শাপ দিবা পুনর্বার ॥

ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে।
হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে॥
দিল্লী হইতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার।
তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার॥
তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায়॥

অবিলম্বে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সুরু হইল। বসুন্ধর অভিশাপগ্রস্ত হইয়া বাংলা-দেশের বাগুয়ান পরগণার অন্তঃপাতী বড়গাছি নামক গ্রামে এক চিরদরিদ্র ঘুঁটে-বেচা গৃহস্থের ঘরে হরিহোড় নাম লইয়া জন্মগ্রহণ করিল।

হরিহোড়ের ঘুঁটে কুড়াইয়া দিন যায়। সে নিজে ও বৃদ্ধ পিতামাতার সংসার এই ঘুঁটে-বেচা পয়সা দিয়াই চলে। একদিন হরিহোড মাঠে গিয়া দেখিতে পাইল যে, তাহার পূর্বেই এক বৃদ্ধা মাঠে আসিয়া সব ঘুঁটে কুড়াইয়া একটা ঝুড়িতে ভর্তি করিয়াছে। সেই বুড়ী হরিহোড়কেই ঝুড়িটা বহন করিতে বলে। হরিহোড বৃদ্ধাকে সাহায্য করিতে যায়। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গেল, বুড়ী তাহার নিজের বাড়ীতে যাইতে পারিল না। অগত্যা হরিহোড় বুড়ীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসে এবং নিজেরা অভুক্ত থাকিয়া অতিথিসেবা করিতে যত্নবান হয়। কিন্তু ঘরে কিছুই নাই, হরিহোড় মহা বিব্রত বোধ করিতে থাকে। বৃদ্ধা হরিহোড়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ঝুড়ি হইতে একটা ঘুঁটে তুলিয়া হরিহোড়ের হাতে দিয়া ইহা বিক্রয় করিয়া খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া আনিতে বলে। হরিহোড় তো অবাক। কেননা,

এত বলি একখানি ঘুঁটে হাতে লয়ে।
দিলেন হরির হাতে অনুকূল হয়ে॥
ঘুঁটে হইল হেমঘুঁটে দেবীর পরশে।
লোহা যেন হেম হয় পরশি পরশে॥
ঘুঁটে দেখি হেমঘুঁটে হরিহোড়ে ভয়।
একি দেখি অপরূপ ঘুঁটে সোনা হয়॥

দেবীর কৃপায় দারিদ্র্যদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হরিহোড় অচিরেই মস্তবড় বিত্তশালী ব্যক্তি হইয়া উঠে। অতঃপর সে একটি মনোহর দেউল স্থাপন করিয়া তথায় দেবী অন্নদার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করে। হরিহোড়ের দিন সুখেই যায়। কিন্তু প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করিয়া সে অত্যন্ত

ভোগাসক্ত হইয়া পড়ে এবং সেই ভোগ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্য সে বৃদ্ধ বয়সে একটি তরুণীর পাণিগ্রহণ করে। হরিহোড়ের আরও তিনজন প্রাচীনা পত্নী ছিল। বলাই বাহুল্য এই নবীনার সঙ্গে তাহাদের কলহ বাধিয়া যায়।

কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার।
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥
সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে।
যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে॥

অতঃপর ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী সুরু হইয়াছে। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে দেবীর ভবানন্দ-গৃহে গমন পর্যন্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী এবং তৃতীয় খণ্ডে ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া কাব্য সমাপ্ত করা হইয়াছে।

হরিহোড়কে ছাড়িয়া দেবী ভবানন্দের গৃহে যাইতে মনস্থ করিলেন। অতএব একজন স্বর্গবাসীকে প্রথম ভবানন্দরূপে মর্ত্যে পাঠাইবার প্রয়োজন হইল। ইতিপূর্বে কুবেরের অনুচর বসুন্ধরকে হরিহোড়রূপে মর্ত্যে পাঠানো হইয়াছিল। এইবার কুবেরের পুত্র নলকুবরকে (কুবেরের-পুত্র কেন কুবর বলা শক্ত) ধরা হইল। বসন্তকালে শুক্লাষ্টমী তিথিতে দেবী অন্নপূর্ণার পূজা হয়। নলকুবর সেইদিন দেবীর পূজা না করিয়া চন্দ্রিনী ও পদ্মিনী নাম্নী তাঁহার দুই যুবতী পত্নীকে লইয়া কামকুতূহলে মত্ত ছিল। অতএব দেবী তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন। অভিশাপ-গ্রস্ত নলকুবর গঙ্গার পূর্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রামে রাম সমাদ্দার নামক এক শ্রোত্রিয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল ভবানন্দ মজুমদার। নলকুবরের পূর্ব পত্নীদ্বয় চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী নামে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাকালে ভবানন্দের সঙ্গে পরিণীতা হইল। দেবী তখন হরিহোড়ের ঘর ছাড়িয়া গঙ্গা পার হইয়া ভবানন্দের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাপথে,

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥

এই কবিতাটির সঙ্গে সকল শ্রেণীর পাঠকের পরিচয় রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে গীতিকবিতার রসানুসন্ধান বৃথা। তবুও দেবী ঈশ্বরী পাটনীর সঙ্গে যে রহস্যমধুর আলাপ করিয়াছেন তাহা যেন গীতিকবিতার রঙে উজ্জ্বল।

দেবী ভবানন্দের গৃহে গিয়া তাহার পূজা-মন্দিরে এক মনোহর ঝাঁপি রাখিয়া অদৃশ্য হন। ভবানন্দ সেই ঝাঁপি দেখিয়া,

পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা ॥
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে ॥
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবৎ হৈলা ভবানন্দ মজুন্দার ॥
অন্নপূর্ণাপূজা কৈলা কত কব তার।
নানামতে সুখে বাড়ে কহিতে অপার ॥

এইখানেই অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ড অর্থাৎ দেবীর ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে আগমনের অধ্যায় পর্যন্ত কাব্য সমাপ্ত।

[অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর "যশোর নগর ধাম, প্রতাপআদিত্য নাম," সেই প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য মানসিংহকে বাংলাদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মানসিংহ বর্ধমানে আসিয়া ছাউনী ফেলিলেন। ভবানন্দ বর্ধমানে মানসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মানসিংহ ভবানন্দের নিকট বর্ধমানের রাজার রূপবতী কন্যা বিদ্যার সঙ্গে বিদেশী রাজপুত্র সুন্দরের যে প্রণয়লীলা হইয়াছিল তাহার বিবরণ শ্রবণ করেন। এই বিবরণই অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দর অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড ভবানন্দ মজুমদারের পূর্ণ কাহিনী। রাজা মানসিংহ বর্ধমান হইতে যশোরে আসিয়া প্রতাপাদিত্যকে নিহত করেন। এই য় ভবানন্দ মানসিংহকে প্রচুর সাহায্য কবিয়াছিলেন। মানসিংহ ভবানন্দকে দিল্লীতে বাদশাহের নিকট লইয়া যান, বাদশাহ অত্যন্ত প্রীত হইয়া ভবানন্দকে নানাবিধ পুরস্কার দান করেন। ভবানন্দ বাদশাহের নিকট হইতে ফরমান লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং নবদ্বীপে দীর্ঘকাল সুখে রাজত্ব করেন। এই ভবানন্দের বংশেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। এইখানেই অন্নদামঙ্গল কাব্যের পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে।]

॥ কবি ভারতচন্দ্র ও তাঁহার বৈশিষ্ট্য ॥

আধুনিক সমালোচনা-পদ্ধতিতে কোন কবির কাব্য-বিচার-প্রসঙ্গে তাঁহার কবিমানসের বিশ্লেষণ অপরিহার্য। আবার সেই সঙ্গে যে বিশেষ সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ কবির মানস-পরিমণ্ডল গঠনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কার্যকরী হইয়াছে তাহারও পরিচয় লইবার চেষ্টা করিতে হয়। মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবিকুলের মানস-পরিমণ্ডলের পরিচয় জানিতে গিয়া কিন্তু এক বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে, মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবিদের মনোভূমিটি যেন প্রায় একই ছাঁচে গঠিত। ধর্মীয় মনোবৃত্তির প্রেক্ষাপটে এক প্রচণ্ড দৈব শক্তির লৌহনিগড়ে যেন তাঁহাদের মন-প্রাণ আবদ্ধ। ঐ যুগের বৈষ্ণব কবিরা ইহার সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের কবিপ্রাণও এক অনৈসর্গিক প্রেমবন্যার প্রবল স্রোতে সর্বদা দ্রবীভূত। তাঁহারাও প্রথাবদ্ধ সংস্কারের এবং অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত কাব্য-নির্মিতির আমোঘ বিধানের নিকট সর্বদা নতশির।

মঙ্গলকাব্যে এই প্রচলিত সংস্কারের প্রতি আনুগত্য আরও প্রবল। দেশময় অরাজকতা, জীবন-ধারণের অপরিসীম বিড়ম্বনা ও গ্লানি, সর্বত্র এক সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা। এই কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ও সাহস তখনকার দিনে কাহারও ছিল না। দুঃসহ অনিশ্চয়তার বদ্ধমুষ্টি ছিন্ন করিতে হইলে যে বীর্যবত্তা, পুরুষকার তথা মনুষ্যত্বের প্রয়োজন দীর্ঘকাল বাংলাদেশে তাহার অসদ্ভাব ছিল। কাজেই সাংসারিক দুঃখদুর্দশা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য মানুষ অতিমাত্রায় দৈবশক্তির অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া পড়িয়াছিল। একান্ত দৈবনির্ভরতা তখনকার দিনের সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত ছিল। কবিরা সমাজ-বহির্ভূত জীব নহেন, কাজেই তাঁহাদের কাব্যেও এই কথাই বারবার প্রচারিত হইয়াছে যে, পুরুষকারের কোন মূল্য নাই, দৈবের বিরুদ্ধে মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। মনসা-মঙ্গলের চন্দ্রধরকে অনেকে পৌরুষের মূর্ত বিগ্রহ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নহে। চাঁদ সদাগর শঙ্কর ও ভবানীর উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি এই বিত্তবান বণিকের ভক্তি ও আনুগত্য এত প্রবল ছিল যে, তিনি অন্য কোন দেবদেবীকেই সহ্য

করিতে পারিতেন না। ইহাও কি এক ধরণের অন্ধ গোঁড়ামি নয়? ধর্মান্ধ ইসলামপন্থীরা যে নীতি-বিবর্জিত কুসংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হইয়া হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করিয়া থাকে, চাঁদবেণে বা ধনপতির গোঁড়ামিকে অনায়াসেই সেই পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে—শিব-ভক্ত চন্দ্রধর মনসাকে হিন্তালের যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে যায় আর শিবভক্ত ধনপতি লাথি মারিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও বিষ্ণুভক্ত ব্যাসমুনি যতক্ষণ পর্যন্ত না শিবভক্তে পরিণত হইয়াছেন ততক্ষণ তাঁহার দুর্গতির অবধি ছিল না। কবি যে দেবতার উপাসক সকলকেই তাঁহার ভক্ত হইতে হইবে। অন্যথায় কবির দেবতা সেই উদ্ধত ব্যক্তিকে সমুচিত শিক্ষা দিয়া দিবেন। যদি বলা যায় যে, বিদ্রোহীর উদ্ধত ভঙ্গিটির মধ্যেই (বিশেষ করিয়া চন্দ্রধরের) পুরুষকারের ছবি ফুটিয়াছে তবে তাহাও যুক্তিপূর্ণ উক্তি বলিয়া গৃহীত হইবে না। কারণ কবিরা বৈপরীত্য-সৃষ্টি করিয়া নিজের দেবতার মহিমাকে উজ্জ্বলতর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মধ্যযুগেব বাংলাদেশে পুরুষকারের অসদ্ভাবে দৈব-নির্ভরতা সমাজের সকল স্তরে এমন করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল যে, কবিরা তাহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করি যে, কবিরা কোথায়ও সেই সর্বরিক্ত, হৃতসর্বস্ব, গভীর বিষাদে পূর্ণ সমাজকে তাঁহাদের কাব্যে স্থান দেন নাই। জীবন যেখানে নীরস ও নীরক্ত, বাঁচিয়া থাকাই যেখানে এক নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয় সেখানে সেই জীবনের কাব্য রঙে-রসে ও বৈচিত্র্যে রিপূর্ণ হইয়া উঠিবে এইরূপ আশা কেহই করে না। কিন্তু কাব্য হইতে সমাজের প্রায় নির্বাসনও কেহ আশা করে না। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে মানব-চরিত্রের কোন মহিমা নাই। কারণ দৈব যেখানে মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত করিতেছে, মানবচরিত্র দৈবের অনুগ্রহে বা নিগ্রহে পরিচালিত হইতেছে সেখানে মানবচরিত্রের কোন মহিমাই থাকিতে পারে না। ফলে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী সর্বত্র প্রায় এক। সাংসারিক দুঃখ-দুর্দশা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে যে, দৈবশক্তির অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই সমস্ত মঙ্গলকাব্য সরবে এই কথা ঘোষণা করিয়াছে। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ ভীরু প্রাণ অসহায় অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার আশায় দেবতার দ্বারস্থ হইল। অবস্থানুযায়ী সৃষ্টি হইল নানা দেব-দেবীর। সেই দেব-দেবীরা

আবার নিতান্ত ক্রূর-প্রকৃতির। নানাভাবে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। সন্তুষ্ট হইলে তাঁহারা ভক্তের জন্য সব কিছু করিয়া দিতে পারেন। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি এইরূপ পুরুষ ও স্ত্রী-দেবতার বন্দনায় মুখরিত। আবার বন্দনার রীতিটিও সর্বত্র একই প্রকার। এমন কি কাব্য-রচনার কারণটিরও (স্বপ্নাদেশ) ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই।

এই গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের ধারায় সার্থক ব্যতিক্রম হইতেছেন মঙ্গলকাব্যের স্বর্ণযুগের কবি মুকুন্দরাম এবং অস্তায়মান যুগের কবি ভারতচন্দ্র। মুকুন্দরামের কাব্যের কাহিনীর কোন অভিনবত্ব নাই। প্রচলিত কাব্যাঙ্গকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহাব কাব্যে এক আশ্চর্য জীবনানুভূতি তথা সমাজ-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের কাব্যের তথা সমস্ত মঙ্গল-কাব্যের প্রভাব যখন প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে তখন ভারতচন্দ্র শেষবারের মত তাঁহার বিদগ্ধ প্রতিভার আলোকে এই কাব্যশিখাটিকে নির্বাপণের পূর্বে অত্যুদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন।

মঙ্গলকাব্যের এই দুইজন কবির মানস-পরিমণ্ডল তৎকালীন সমাজ-জীবনের প্রেক্ষাপটে আমরা অনুধাবন করিতে পারি। অন্যেরা হাটের ভীড়ে হারাইয়া যান। মনসামঙ্গলের কাব্য-কাহিনী নিরতিশয় করুণ। করুণরসে বাঙ্গালীর আসক্তি চিরকালেই প্রবল। তাই এই কাব্য খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। মনসামঙ্গলে সমাজ-জীবন, বাঙ্গালীর বাণিজ্য-যাত্রা প্রভৃতির উপাদান ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, ঐগুলি নিতান্তই গতানুগতিক ও প্রথাবদ্ধ। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে যেমন খুন-জখম, রাহাজানি, নারী-ধর্ষণ দেওয়াই চাই ঠিক তেমনি মঙ্গলকাব্যগুলিতে রান্নার লম্বা ফর্দ, বারমাসিয়া দুঃখের বিবরণ, বণিকের সওদার বিস্তৃত তালিকা থাকিবেই। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, চাঁদবেণের বদল-বাণিজ্যের যে ফর্দ মনসা-মঙ্গলের কবিরা তৈয়ারী করিয়াছেন, চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগরের সিংহল-যাত্রাকালীন ফর্দটির সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। দিল্লী হইতে বহুদূরে অবস্থিত বাংলাদেশে মোগল-পাঠানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখানকার সমাজ-জীবন তথা ব্যক্তিজীবনে যে নিদারুণ দুর্গতি দেখা দিয়াছিল একমাত্র মুকুন্দরাম ব্যতীত আর কোন কবিরই সেই সম্পর্কে কোন প্রকার চেতনা ছিল বলিয়াই মনে হয় না। অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা দেশে পতনোন্মুখ মোগলশক্তি, মারাঠাদস্যুদের প্রবল উৎপীড়ন, সর্বোপরি সাত সমুদ্র তের নদীর

ওপার হইতে আগত বৈদেশিক শক্তির নিকট জীবনের চেয়েও প্রিয় দেশের স্বাধীনতার অবলুপ্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, জীবনের নানাক্ষেত্রে অপরিসীম গ্লানি যেভাবে মানুষকে বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহার কোন পরিচয়ই আমরা পাই না। বরং ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদের অমর সঙ্গীতগুলিতে এই পরিচয় অনেক বেশী স্পষ্ট। তবুও অন্যদিক দিয়া ভারতচন্দ্রেব সমাজ-সচেতনতা কিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে অতঃপর আমরা তাহা আলোচনা করিয়া দেখিব। কিন্তু এই দিক দিয়া ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব তেমন উজ্জ্বল নহে। ভারতচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি এক মৃতপ্রায় কাব্যদেহকে অতুলনীয় প্রতিভার স্পর্শে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয়ঃ অতি সাধারণ বস্তুকে অসাধারণত্বের মহিমায় ভূষিত করা, বর্ণহীন একঘেঁয়েমির মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত চমৎকৃতির সৃষ্টি একমাত্র সার্থক প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। ভারতচন্দ্র এই প্রতিভাব যথার্থ অধিকারী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রায় জন্মলগ্ন হইতেই মঙ্গলকাব্যের বিজয়াভিযান আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই অভিযানেব গৌরবের প্রায় সবটুকুই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বিষয়বস্তু এবং বর্ণনারীতি এই উভয়ের কোন প্রকার বৈচিত্র্য না থাকায় জনচিত্তে মঙ্গলকাব্যের আর কোন আবেদন ছিল না। ভারতচন্দ্র তাঁহার অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে আমাদের সাহিত্যেব এই মৃতপ্রায় শাখাটিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রতিভাধর কবি বলিয়াই ভারতচন্দ্র একথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, মঙ্গলকাব্যের মৃতদেহে প্রাণেব সঞ্চার করিতে হইলে গতানুগতিক পন্থা অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে। তাই কাব্যের প্রারম্ভেই কবি বলিয়াছেন,

নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়॥

এই 'নূতন মঙ্গল' কথাটির অর্থ দুই দিক হইতে দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ, গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের শ্রেণীতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। কারণ মঙ্গলকাব্যের মূলগত বক্তব্যের সঙ্গে অন্নদামঙ্গলের বিস্তর পার্থক্য রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা যেন-তেন প্রকারে তাঁহাদের পূজা-প্রচারে ব্যস্ত। তাঁহাদের পূজায় যে রাজী হইবে না তাহাকে জব্দ করিবার জন্য এই দেবতারা সদসৎ যে-কোন পন্থা অবলম্বনে

পশ্চাৎপদ নহেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এই জাতীয় কোন ঘটনা নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতচন্দ্র শুধু মঙ্গলকাব্যের কাঠামোটিকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কাঠামোতে নিজের যুগের রুচি এবং তাঁহার নিজস্ব বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবেশ ঘটাইয়াছিলেন। কাজেই সংজ্ঞা-বিচারে অন্নদামঙ্গল খাঁটি মঙ্গলকাব্য নহে। অন্যদিকে দেবী অন্নপূর্ণা বা অন্নদার মাহাত্ম্য-সূচক কাব্য তিনিই প্রথম লিখিতেছেন 'নূতন' কথাটির একটি অর্থ তাহাই। যাই হোক, সকল দিক দিয়া এই যে নূতনত্বের উদ্বোধন তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিভার পরিচায়ক। প্রথানুগত্যের প্রতি অস্বীকৃতি, নূতনের উদ্বোধন, যুগরুচির প্রতিফলন, সর্বপ্রথম নাগরিক-জীবনের সার্থক চিত্রলিপি, শ্লেষ-কৌতুকমিশ্রিত এক তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিস্ফুটন প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের প্রতিভার নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তদুপরি যুক্ত হইয়াছে কবির সুগভীর পাণ্ডিত্য।

যুগধর্ম, যুগরুচি ও সমাজ-চেতনা: ভারতচন্দ্র মুসলমানী আমলের অন্তিম লগ্নের কবি। ঐ সময় সমগ্র দেশে যে জঘন্য রুচিবিকৃতি ঘটিয়াছিল ভারতচন্দ্র সেই প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের অদূরেই সুবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। ভারতচন্দ্র যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন তখন নবাব আলিবর্দী খাঁয়ের শাসনকাল প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। নবাবের দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা নবাবের জীবিত-কালেই নবাবের দরবারকে এক পূতিগন্ধময় নরকে পরিণত করিয়াছিল। মানুষের হীন প্রবৃত্তিগুলি তখন সবিশেষ অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছিল। অবাধ কামকেলি, লম্পট ও মদ্যপের নারকীয় উল্লাস সমগ্র অভিজাত সমাজকে তখন ক্লেদাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নৃত্য-গীতে, হাসি-ঠাট্টা-ভাঁড়ামিতে, নারীদেহের তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনায়, আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করিবার বিচিত্র উপায়-নির্ণয়ে সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিরা শুধু কামনার বহ্নিশিখাকে অনির্বাণ রাখিতে তৎপর ছিলেন, দেশ, জাতি, সমাজ, জীবনের উচ্চতর বৃত্তি—কোন কিছুর প্রতি কাহারও বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। এক নিদারুণ শিথিলতাপূর্ণ ক্লেদ-পিচ্ছিল পথে সমাজ তখন রসাতলের পথে অগ্রসর হইতেছিল।

একদিকে নগর-জীবনের এই চিত্র। অপরদিকে দেখিতে পাই গ্রাম-বাংলার শোচনীয় চিত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দিল্লীর রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া বাংলাদেশেও পৌঁছিল। একদিকে বাংলাদেশে দিল্লীর প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ অপরদিকে বাংলার নবাবী মসনদ লইয়া বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র ও আত্ম-কলহ।

ইংরাজ-বণিকশক্তি এই চক্রান্তে নাক গলাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৎপর। সমগ্র দেশ অরাজকতায় আচ্ছন্ন। এমন সময় আবার মারাঠাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়িল বাংলাদেশের উপর। তাহাদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী ভুলিবার নয়। সেই কুখ্যাত বর্গীর হাঙ্গামার বিবরণ আমাদের ছড়াগুলিতে পর্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছে। এই হাঙ্গামার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-জীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। আবার পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রবের ফলে বাংলার বাণিজ্যের অবস্থাও সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। নবাবের তো বটেই, প্রজার উপর সাধারণ জমিদারের অত্যাচারও সকল প্রকার সহনশীলতার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। পাইকারী ও খুচরা দ্রব্য-সামগ্রীর উপর নবাব, জমিদার, ভূস্বামিবর্গ এত অধিক করভার চাপাইয়া দিয়াছিলেন যে, দৈনন্দিন অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রের—চাল, ডাল, নুন, তেল ইত্যাদির মূল্য অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। ফলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্গতির অবধি ছিল না। কুশাসন, দস্যুর উপদ্রব, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র এক নিদারুণ আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়াছিল। অন্যায়ভাবে প্রজাকে ধরিয়া মারপিট, বিনা কারণে নীলাম, ডিক্রিজারী, নায়েব-গোমস্তা, পেয়াদা ইত্যাদির অত্যাচার, মহাজন এবং বণিকদের উপর দস্যুর হামলা, অবাধ লুণ্ঠন ও নরহত্যা—এই ছিল তখনকার দিনে বাংলা-দেশের দৈনন্দিন চিত্র। সাধারণ মানুষের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাংলাদেশের সর্বত্র তখন অবাধে মানুষ বিক্রয় হইত। বিদেশী বণিকেরা সমর্থ পুরুষ, সুন্দর শিশু ও নারীদিগকে ক্রয় করিয়া দেশ-দেশান্তরে চালান দিত।

এই নিদারুণ অবস্থার প্রতি কিন্তু দেশ যাঁহারা শাসন করিতেন তাঁহাদের কোন দৃষ্টি ছিল না। বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া তাঁহারা সমগ্র দেশকে নরকে পরিণত করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে যে বিলাস-কলা-কৌতূহলের স্রোত প্রবাহিত হইত তাহার প্রভাব বিত্তবান ভূস্বামীদের উপরও বর্তাইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা বা দরবারেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। এই শ্রেণীর দরবারে একদল লোক সর্বদাই রাজার মনোরঞ্জনে লিপ্ত থাকিত। রাজ-তোষামোদই ছিল তাহাদের জীবিকানির্বাহের একমাত্র পন্থা। বিকৃতরুচির বিদূষক হইতে স্বল্প কিংবা স্বল্পাধিক প্রতিভাবিশিষ্ট কবিবৃন্দ রাজা মহাশয়ের কামনার, যৌনবিলাসের এবং স্থূলরুচির ইন্ধন যোগাইতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবারটিও এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সদা-উপস্থিতিতে রসসিক্ত হইয়া থাকিত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন অতিশয় ধূর্ত-প্রকৃতির ব্যক্তি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সদসৎ কোন কর্মেই তাঁহার অরুচি ছিল না। সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তিনি একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে তিনি নিঃসন্দেহে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কবিবর রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্র, প্রাক্-আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের এই দুই দিক্‌পাল কবির তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহারাজের দরবারে রুচি মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারেরই অনুরূপ ছিল। ছলাকলাময় হাস্য পরিহাস, বিকৃতরুচির কৌতুক ও ভাঁড়ামি, নৃত্যগীতাদি প্রভৃতি কিছুরই অভাব তাঁহার দরবারে ছিল না। তবে সেই সঙ্গে পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের অনুশীলনও কিছু কিছু চলিত।

ভারতচন্দ্র এই রাজ-দরবারের কবি। রাজার অনুগ্রহে পুষ্ট হইয়া রাজার মনোরঞ্জন করাকে তিনি যদি কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে দোষারোপ করা চলে না।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদে সকলেই আদিরসের প্লাবনে গা ভাসাইয়া মহানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন এই আনন্দবাজারের একজন প্রধান হোতা। কিন্তু তবু আমরা বলিব যে, আদিরস ভারতচন্দ্রের কাব্যের অঙ্গীরস হইলেও মুখ্য রস নহে। তাঁহার কাব্যের সর্বত্র এক অন্তর্লীন কৌতুকরস আদিরসকে প্রাধান্য বিস্তার করিতে দেয় নাই। আর এই আদিরসের ছড়াছড়ির জন্য ভারতচন্দ্রকে দায়ী করিলে চলিবে না। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা যাঁহারা আলোকিত করিতেন বলা বাহুল্য জীবনের কোন কিছুর প্রতিই তাঁহাদের আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। দেবদেবীর প্রতি তাঁহাদের ভক্তি কতটা ছিল বলা শক্ত। রাজসভার অনুগৃহীত কবির পক্ষে রাজা এবং তাঁহার সভাসদদের মনোরঞ্জন না করিয়া উপায় ছিল না। কিন্তু ভারতচন্দ্রের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী একথাই আমাদিগকে বারে বারে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, কবি তাঁহার এই অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই কৌতুকের আড়ালে গা ঢাকা দিয়া তিনি নিজের অন্তরাত্মাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

শাক্ত কবি রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের সম-সাময়িক কবি। উভয়েই কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগৃহীত ছিলেন। ঐ যুগের রুচিই এমনি ছিল যে, রামপ্রসাদকে পর্যন্ত বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত চাতুর্য বা তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকাতে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর অত্যন্ত স্থূল-প্রকৃতির অশ্লীল কাব্যে পরিণত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, ভারতচন্দ্রের খ্যাতি এবং নিন্দা উভয়ই তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যের জন্য। এই কাব্যে কবি যেন আদিরসের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আশ্চর্য হইয়া আমরা লক্ষ্য করি যে, কবি তাঁহার স্বাভাবিক বীক্ষণশক্তি এবং তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী হারাইয়া ফেলেন নাই। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এমন বহু পংক্তি রহিয়াছে যাহা সর্বকালের মানবচরিত্রসম্পর্কে প্রযোজ্য। তাই আমরা দেখি যে, ঐ পংক্তিগুলি বাংলা প্রবচনে পরিণত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের সমাজচেতনা সম্পূর্ণ নগরজীবনকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশলাভ করিয়াছে। প্রাক্-আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের তিনিই প্রথম এবং একমাত্র কবি যাঁহার কাব্যে নগর-জীবনের চিত্র স্থান লাভ করিয়াছে। কবি নিজেও জীবনের অধিকাংশ সময় নগরে অতিবাহিত করিয়াছেন। বর্ধমান, কটক, ফরাসডাঙ্গা এবং নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর, পূর্ব-ভারতের এই কয়টি বিশিষ্ট নগরীর সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন সময়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। আড়ম্বর ও বিলাসিতাপূর্ণ নগরজীবনের রীতিনীতি ও সেই ছলাকলাপূর্ণ সমাজ পটভূমিকায় থাকিয়া তাঁহার কাব্যকে প্রভাবিত করিয়াছে। অথচ তখন বাংলাদেশের এক মহা সঙ্কটপূর্ণ কাল উপস্থিত। আপামর জনসাধারণ তখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিপীড়িত ও বঞ্চিত। সেই অসহায় জনগণের কোন চিত্রই ভারতচন্দ্র আমাদের জন্য রাখিয়া যান নাই। কুটিল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে দেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, মুর্শিদাবাদের অদূরে বসিয়া কবি তাহার খবর নিশ্চয়ই পাইতেন কিন্তু সেই সম্পর্কে তিনি একেবারে নীরব। অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ষড়যন্ত্রকারীদের একজন ছিলেন আর ঐ ষড়যন্ত্রের ফলে যে দেশের স্বাধীনতা লুপ্ত হইতে পারে এমন ধারণাও বোধ হয় তখন কাহারো ছিল না। স্বাধীনতা-সম্পর্কে কোন চেতনা ছিল কিনা সেই সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিষয়বস্তুর কালসীমাকে যদি জাহাঙ্গীরের আমল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তবে বলা যাইতে পারে যে, সম-সাময়িক ঘটনার তাহাতে স্থানলাভ করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। কিন্তু কবি যেভাবে কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণনা করিয়াছেন, সৈন্য-সামন্ত ও সেনানিবর্গের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে মুর্শিদাবাদ বা ইংরাজ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ থাকিবে এমন আশা করা খুব অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

গ্রাম-বাংলা সম্পর্কেও ভারতচন্দ্র আশ্চর্য রকম নীরব। রাজা, জমিদার মহাজন, জলদস্যুদের উৎপীড়নে হৃতসর্বস্ব বাঙ্গালী সেদিন যে নিদারুণ অবস্থা-

বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াছিল ভারতচন্দ্র যেন এক নির্বিকার ঔদাসীন্যে তাহাদের কথা বাদ দিয়াছেন। অথচ তাঁহার সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদের ভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলিতে নিপীড়িত বাঙ্গালীর আর্ত রোদনধ্বনি এক বেদনা-মধুর রাগিণীতে ধ্বনিত হইয়াছে।

হর-গৌরীর সংসারের দুঃখময় চিত্র, বৃদ্ধ মহাদেবের সঙ্গে কুমারী গৌরীর পরিণয়, হরিহোড়ের পত্নীদের মধ্যে সতীনসুলভ বিবাদ প্রভৃতি চিত্রকে ঐযুগের সমাজচিত্রের প্রতিফলন হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু সমাজ-চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতচন্দ্র ঐ চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন এমন মনে করিবার কারণ নাই। নিতান্ত গতানুগতিকভাবেই তাঁহার কাব্যে ঐ প্রসঙ্গগুলি আসিয়া পড়িয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরামের কাব্যে ঐ চিত্রগুলি আরও উজ্জ্বল আরও প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দরিদ্র ও বৃদ্ধ স্বামীর নিকট কন্যাকে অর্পণ করিয়া জননীর হৃদয়ে ব্যথার যে সমুদ্র উথলিয়া উঠে রামপ্রসাদের সঙ্গীতে তাহা আরও প্রত্যক্ষ এবং কাব্যগুণসমৃদ্ধ।

কাজেই ভারতচন্দ্রের সমাজচেতনা যে, শুধুমাত্র নগরজীবনকেই কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ: মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার অসীম সৌভাগ্য এই যে, ঐ সভায় ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই দুইজন শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই দুই কবির মানসভঙ্গী যেন দুই বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। একই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও এই যে বৈপরীত্য তাহা স্বভাবতঃই আমাদের কৌতূহলের উদ্রেক করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌঁছিয়া বাংলা মঙ্গলকাব্যের আবেদন বহুলাংশে লোপ পাইয়া গেল। যে ভীতি ও স্বার্থবুদ্ধি হইতে মঙ্গলকাব্য তথা ঐ কাব্যে বর্ণিত দেবদেবীগণের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিল সন্দেহ নাই. কিন্তু ভীতি ও স্বার্থবুদ্ধি হইতে সঞ্জাত ভক্তিরস তাহার প্রকাশের মাধ্যম পরিবর্তন করিয়া ফেলিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত একশত বৎসরের বাংলাদেশের ইতিহাস প্রজাপুঞ্জের উপর রাজশক্তির নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারের ইতিহাস। ধনী মুহূর্তের মধ্যে পথের ভিক্ষুকে পরিণত হয়, দরিদ্র বিনা কারণে প্রাণ দেয়—জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক অভাবনীয় অনিত্যতার প্রভাব দেখা দিল।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে নিপীড়ন আসিল তাহা হইতে কে রক্ষা করিবে এই প্রশ্নটি মানুষের মনে তখন প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল। অনন্যোপায় ভীরু-প্রাণ অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই জগজ্জননীর চরণে আশ্রয় খুঁজিল। জগজ্জননী মাতার নিকট করুণ আবেদন জানাইয়া ভক্ত সন্তান নিজেকে রক্ষা করিবার পথ খুঁজিয়া বাহির করিল। ভক্ত-হৃদয়ের এই আর্তিপ্রকাশের জন্য কোন বৃহদাকৃতি কাহিনীর প্রয়োজন হইল না। গীতিকবিতাব সুরে ভক্তের নিবেদন ও দেবমহিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভক্তকবি রামপ্রসাদ এই গীতিকবিতাগুলির প্রবর্তক।

রামপ্রসাদ ভক্ত ছিলেন, ভারতচন্দ্র ভক্তির বিশেষ কোন ধার ধারিতেন না। বিশেষ এক উদ্দেশ্যে তিনি দেব-বন্দনাকে তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু করিয়াছিলেন। উভয়ের মনোভঙ্গী যেখানে এত বিপরীত সেখানে তাঁহাদের কাব্যের বিষয়বস্তুর সমালোচনা অবান্তর। তাই শুধু কাব্য-প্রতিভা এবং সমাজ-চেতনার দিক দিয়াই কবি-দ্বয়ের সমালোচনা সম্ভব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সর্ববিক্ত সমাজ ও হৃতসর্বস্ব মানুষের বেদনার কথা রামপ্রসাদের কবিচিত্তকে গভীরভাবে অালোড়িত করিয়াছিল। কোন্ পাপে, কি অপরাধে মানুষের ভাগ্যে এই নিদারুণ বঞ্চনা তাহা ভাবিতে গিয়া রামপ্রসাদ বিমূঢ় হইয়াছেন। তাই সন্তান যেমন জননীর কাছে অভিমান করে তেমনি তিনি জগজ্জননীর কাছে অভিমান করিয়া বলিয়াছেন,

মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন অবিচাবে আমার 'পরে, কবলে দুঃখের ডিক্রী জারি ?

যদিও এই অভিমানের আড়ালে অধ্যাত্ম-চেতনা সুস্পষ্ট তবু সমাজ-জীবনের চিত্রের মাধ্যমেই তিনি মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

সমাজদেহের নিদারুণ বৈষম্য তাঁহাকে এত পীড়িত করে যে, তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,

জানি গো জানি তারা, তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত গেঁটে সোনা॥
কেহ যায় মা পাল্কী চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ গায় দেয় শাল দোশালা কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা॥

রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলিতে সমাজ-জীবনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভক্ত কবি তাঁহার সঙ্গীতের সর্বত্র আকারে-ইঙ্গিতে, তুলনায়-রূপকে, সমাজ-

জীবনের কথাই নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই তাঁহার পদগুলিতে পেয়াদা-পাইক-বরকন্দাজ, সমন ও ডিক্রি জারি, কলুর ঘানি, পাশা-খেলা, ঘুড়ি-ওড়ানো, কৃষিকাজ, অনাবাদী জমি, শিকারী পাখী ইত্যাদির রূপকের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রামপ্রসাদ এই অভিযোগ-বর্ণনায় সমস্ত সুখ-দুঃখের মূলীভূত কারণ যিনি তাঁহার পদচ্ছায়ায় আশ্রয় লওয়াই এই দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র পন্থা বলিয়া মনে করিয়াছেন। মানুষের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসা ছিল অপরিসীম। মাতৃপদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেই সব দুঃখের সমাধান হইবে এই ছিল তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যুক্তিসিদ্ধ কিনা তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, আপন শক্তিতে মানুষ সব কিছু করিতে পারে এমন বিশ্বাস তখনকার দিনে কাহারো ছিল না। রামপ্রসাদ তাঁহার বিশ্বাসকে অপূর্ব-মধুর সঙ্গীতে সমর্পণ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ঐ যুগের নিপীড়িত মানুষ তাহাতে সান্ত্বনা পাইয়াছে। এক বিশিষ্ট সঙ্গীতের প্রবর্তক এবং বাস্তবগ্রাহ্য সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে রামপ্রসাদের অবদান কোনদিনই বিস্মৃত হইবার নয়।

ভারতচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে নগরজীবনের কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাগরিক-জীবনে যে প্রবল নীতিহীনতা দেখা দিয়াছিল, যে কামবিলাসের স্রোত দেশকে রসাতলাভিমুখী করিয়াছিল ভারতচন্দ্র তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রাজসভার কবি বলিয়া তাঁহাকে উহার কিছুটা তৃপ্তিবিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সমাজের গ্লানি-সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। কিন্তু নিজের অবস্থা বিবেচনায় কবি ভিন্নপথ অবলম্বন করিলেন। সমাজের কদর্য রূপ তাঁহাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শর নিক্ষেপ করিতে প্রেরণা দিল। রামপ্রসাদ যেমন তাঁহার মনের বিশিষ্ট ভঙ্গী প্রকাশ করিবার জন্য ক্ষুদ্রাকৃতি গীতিকবিতা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন ভারতচন্দ্র তেমনি "নূতন মঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন। তিনি মঙ্গলকাব্যের কাঠামোটুকুই শুধু গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে নিজের তির্যক, তীক্ষ্ণ ও চটুল ভঙ্গীদ্বারা রূপবদ্ধ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ যেমন তাঁহার গানগুলিকে প্রয়োজনমত ছন্দে সজ্জিত করিয়াছেন ভারতচন্দ্রও তেমনি তাঁহার কাব্যে অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

ঐ যুগের আদিরস ও স্থূলরুচিকে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ কেহই এড়াইতে পারেন নাই। পারেন নাই বলিয়াই উভয়েই বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তবে আদিরস যাহা ভারতচন্দ্রের কাব্যের নিঃশ্বাস, রামপ্রসাদের কাব্যের তাহা নির্জীবন।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র : কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র এই দুই প্রতিভাধর কবি মঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। ভারতচন্দ্র যেমন তাঁহার মঙ্গলকাব্যকে যুগোপযোগী করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়াছিলেন মুকুন্দরামের কাব্যও তেমনি সমাজ ও ইতিহাস-চেতনায় অভিনবত্বের মর্যাদা পাইবার অধিকারী। ভারতচন্দ্রের বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে শ্লেষ ও ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণতর হইয়াছে। মুকুন্দরামের কৌতুকপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু সেই কৌতুক ব্যঙ্গের বাণ গ্রহণ করে নাই। এক স্নিগ্ধ-মধুর পরিহাস-রসিকতা মুকুন্দরামের কাব্যের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্রের ভাষার যে মার্জিতরূপে আমরা মুগ্ধ হই তাহার প্রবর্তক হইতেছেন মুকুন্দরাম। মঙ্গলকাব্যের কবিকুলের মধ্যে তিনিই ভাষায় গতিশীলতার সঞ্চার করিয়া "বাংলা কাব্য-ভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি" ঘটাইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে শুধু নগরজীবনের চিত্রই প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্য সমাজ-চেতনার প্রকাশে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরামের কাব্য-বচনাকালে পাঠানশক্তি বাংলাদেশ হইতে প্রায় উৎখাত হইয়াছে, মোগল-শক্তি তাহাদের আধিপত্য পুরাপুরি বিস্তার করিতে পারে নাই। দেশে ভয়ানক অরাজক অবস্থা। জায়গীরদারেরা তাহাদের অধিকার লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল, গরীব প্রজার উপর সর্বরকমের অত্যাচার চলিতে থাকিল। এই অত্যাচারে কবি মুকুন্দরামকে গৃহহারা হইতে হইয়াছিল। বি তাঁহার কাব্যে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে এই অরাজক অবস্থাব অতি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। ফলে তাঁহার কাব্য ঐ শতাব্দীর ইতিহাস-রচনার উপাদান যোগাইয়াছে। ভারতচন্দ্রে এই ধরণের সমাজ-চেতনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

মুকুন্দরামের কাব্যও কবির মনোরম কৌতুকপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কিন্তু তাঁহার কৌতুকে ব্যঙ্গের বাণ নাই। বস্তুতঃ হাস্যরসিকের জীবনদৃষ্টি এক উদার ক্ষমাসুন্দর জীবনদৃষ্টি। তাহাতে জীবন ও জগতের ভ্রূকুটি ও সহস্র অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাঁহার কোন তিক্ত অভিযোগ থাকে না। হাস্যরসিক শুধু চোখে আঙুল দিয়া এই বৈষম্য ও অসঙ্গতির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জগতের সমস্ত অসঙ্গতি ও অসাম্যের বিরুদ্ধে যখন সমাজ ও রাষ্ট্রনেতারা বিদ্রোহ সুরু করিয়াছেন তখন হাস্যরসিক একান্তে চিন্তা করিতেছেন, কোন্ অমোঘ নিয়তি ও দুর্দৈবের ফলে বিধাতার সৃষ্টি এই সুন্দর পৃথিবীর মাঝে এই অযাচিত দুর্দৈব

নামিয়া আসিয়াছে। তাঁহার কাছে তাই সমাজের এই সমস্ত মানুষ, যাহারা দুর্দৈব ও অশান্তি ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহারা কৌতুকের পাত্র। মুকুন্দরামের কাব্যে এই কৌতুকপ্রিয়তাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতচন্দ্রের কৌতুকপ্রিয়তা আদিরসের পোষকতা করিয়াছে কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্য 'নির্মল, শুভ্র ও সংযত' হাস্যরসের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মুকুন্দরামের কাব্যে বাস্তবরসানুভূতি ও জীবনানুভূতি অতিশয় উজ্জ্বল কিন্তু ভারতচন্দ্রে তাহা প্রায় অনুপস্থিত। মুকুন্দরামের বন্দিতা দেবী আর্ত ও নিপীড়িত মানবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। ভারতচন্দ্রের দেবী বিলাসীর বিলাসোপকরণের একটি অঙ্গ মাত্র। হরগৌরীর সংসারের যে চিত্র উভয় কবি অঙ্কন করিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়াই উভয় কবির দৃষ্টিভঙ্গীর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম-বর্ণিত এই চিত্রে বাঙ্গালীর দরিদ্রঘরের গার্হস্থ্য-জীবনের কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্র নিতান্তই গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। মধ্যযুগের এই দুই বিশিষ্ট কবির কাব্য পাঠ করিলে এই কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ভিন্ন রুচি, ভিন্ন সংস্কার ও সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই যুগের প্রেক্ষাপটে এই কাব্য দুইখানি রচিত। একজন মঙ্গলকাব্যের স্বর্ণযুগের কবি, অপরজন অস্তায়মান যুগের কবি। মুকুন্দরামের কাব্য স্বভাবগুণে মধুর আর ভারতচন্দ্রের কাব্য 'সরস' ভঙ্গীর জন্য মধুর।

দুইশত বৎসরের পরবর্তী হইয়াও ভারতচন্দ্র কিন্তু মুকুন্দরামের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। হর-গৌরীর সংসারের চিত্র-বর্ণনায় এই প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট। এই প্রভাব কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়গত। কবিত্বের দিক দিয়া ভারতচন্দ্র নিঃসন্দেহে অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। যেমন মুকুন্দরামের কাব্যে ছদ্মবেশধারিণী চণ্ডী আত্ম-পরিচয়-প্রসঙ্গে কালকেতুকে বলিতেছেন,

কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে।

আর অন্নদামঙ্গলে দেবী ঈশ্বরী পাটুনীর কাছে ঐ প্রসঙ্গেই বলিতেছেন,

গঙ্গা নামে মোর সতা তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সেই স্বামী শিরোমণি॥

ভারতচন্দ্রের শিল্প-প্রতিভা: ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে পুরাতন বস্তুকে নূতন আধারে পরিবেশন করিয়াছেন। পুরাতন আধার যে অচল হইয়া

পড়িয়াছে একথা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই উপলব্ধি তাঁহার সম-সাময়িক অন্য কবির ছিল না। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে তিনি নূতন আধার নির্মাণ করিলেন। মঙ্গলকাব্যের জীর্ণ দেহ তাঁহার প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি 'নূতন মঙ্গল' সৃষ্টি করিলেন। নূতন কাব্যের ভাষাও একেবারে নূতন না হোক অন্ততঃ পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। ভারতচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সরস ভাষাই কাব্যের প্রাণ। তাই,

পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে দেবীর বন্দনা-গান গীত হইয়াছে সেই দেবী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ-পরায়ণা। মহারাজ সেই দেবীর পূজার্চনার রাজসিক ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন। এইরূপ দেবীর বন্দনা-গানে ভারতচন্দ্রের ভাষা যে স্বভাবতঃই উজ্জ্বল ও আড়ম্বরপূর্ণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভারতচন্দ্রের শিব ও অন্নপূর্ণা ঐ যুগের মানবিক বেশ ধারণ করিয়াছেন। তাই দেখি, অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনা ও বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার রূপবর্ণনায় পার্থক্য অতি অল্পই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের সর্বত্র নগর ও রাজসভার জীবনের ছাপ অতি সুস্পষ্ট। ঐ জীবনের রুচি ও রূপেরই তিনি প্রধান কারবারী। নগরজীবনের প্রতিনিধি বলিয়াই ভারতচন্দ্রের ভাষা এত মার্জিত এবং অলঙ্কারবহুল হইতে পারিয়াছে। তদুপরি সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকায় তাঁহার কাব্য শিল্পচাতুর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য। কিন্তু বলা বাহুল্য তাঁহার কাব্যের সঙ্গে জীবনের যোগ অতি অল্প। যাই হোক তাঁহার শিল্প-চাতুর্যের প্রসঙ্গটি আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু তৎপূর্বে একটি কথার উল্লেখ করিয়া রাখা ভাল যে, ভারতচন্দ্রের শিল্প-চাতুর্যের সামগ্রিক বিচারে বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কারণেই আমরা তাহা হইতে বিরত রহিলাম। তবে অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডেও ভারতচন্দ্রের ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রবচনবহুল বাগ্‌ভঙ্গীর অসদ্ভাব নাই। এই প্রসঙ্গে অন্নদামঙ্গল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—'রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত; যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনই তাহার কারুকার্য।' বলা

বাহুল্য কবিগুরুর এই উক্তিটি অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড সম্পর্কেই প্রযোজ্য বলিয়া আমরা মনে করি।

ভারতচন্দ্রের 'সরস' ভাষার কথা বলিতে গেলে তাঁহার ছন্দোবদ্ধ এবং অলঙ্কারবহুল কাব্যধারার কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। ভারতচন্দ্রের পূর্বে বাংলা কাব্য ছন্দের দিক দিয়া অতিশয় দুর্বল ছিল। পয়ার, ত্রিপদী ছাড়া বাংলা কাব্য ইতিপূর্বে অন্য কোন ছন্দে রচিত হয় নাই। ফলে কিয়ৎ-কালের মধ্যেই এই ছন্দে অবশ্যই একঘেঁয়েমি দেখা দিয়াছিল। ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যকে সরস করিবার জন্য ছন্দে বৈচিত্র্য আনয়ন করিলেন। ভাবানুযায়ী ছন্দ-নির্বাচনেই যে তিনি শুধু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এমন নয়, এই ছন্দকে তিনি প্রবাহিত করিয়াছেন সার্থক শব্দ-সমষ্টির মধ্য দিয়া। তাঁহার শব্দ-নির্বাচন বা শব্দলীলা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যেরই ফলশ্রুতি। তৎসম, অর্দ্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী এই সব রকমের শব্দই তাঁহার কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সতীর দেহত্যাগের সংবাদে বিচলিত শিব দক্ষালয়ে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বিষাদ-ক্ষুব্ধ চিত্তের সম্যক প্রকাশ ঘটাইবার জন্য কবি সংস্কৃত ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা॥

ভূতপ্রেতগণ দক্ষযজ্ঞনাশে মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের উন্মত্ত কলরোল কবি তূণক ছন্দের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোররোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥

এই সকল ছন্দ যেমন ভাবানুযায়ী সার্থক হইয়াছে তেমনি উহাতে ব্যবহৃত শব্দাবলী প্রয়োগনৈপুণ্যে অতিশয় অর্থবহ হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম উদাহরণে গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গলীলা এবং দ্বিতীয় উদাহরণে ভূতপ্রেতগণের নৃত্যের উন্মত্ততা যেন উপযোগী রাগিণীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ-ব্যবহারে ভারতচন্দ্রের

অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। দেবী অন্নদা শিবকে অন্নদান করিতেছেন, ভোজনের আনন্দে শিব মাতিয়া উঠিয়াছেন,

পঞ্চ মুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাদের মত॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক পর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চূষ্য চুষিয়া॥
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া।
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥

একাবলী ছন্দে রচিত এই বর্ণনাটির অন্য গুণ না থাকিলেও ভাবানুযায়ী সার্থক হইয়াছে বলিতেই হইবে।

অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যাহাদের উপাদেয় এবং স্বাদু বর্ণনাভঙ্গী দেখিয়া উহাদিগকে গীতিকবিতা বলিয়া অভিহিত করিতে ইচ্ছা করে। এই কবিতাগুলিতে কবির আত্মগত তন্ময় ভাব স্বভাবতঃই পাঠকের মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি করে। দুয়েকটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইতে পারে। 'কৈলাস বর্ণন' কবিতায়,

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস॥
... ...
তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফুলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত॥
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে॥

অথবা 'অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান' কবিতায়,

কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে।
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে॥

অথবা সেই বিখ্যাত "অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা" কবিতা। এই কবিতাটিতে জগজ্জননী ও সন্তানের মধুর রহস্যপূর্ণ সংলাপে ভারতচন্দ্র যেন তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও কৃত্রিমতার আবরণখানি ফেলিয়া দিয়া মাতৃস্নেহভিক্ষু সনাতন বাঙ্গালী সন্তানে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার কাব্যে যে জীবনরসের একেবারে অসদ্ভাব নাই তাহা এই কবিতাটিতে বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' পাটুনীর এই উক্তির মধ্য দিয়া ভারতচন্দ্র ঐ যুগের বাঙ্গালী-হৃদয়ের কামনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র তাঁহাব কাব্যে যে-সকল অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন তন্মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, উপমা, শ্লেষ, রূপক, ব্যাজস্তুতি, ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তরন্যাস, অসঙ্গতি ও স্বভাবোক্তি অলঙ্কারই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বিদ্যাসুন্দর কাব্যেই কবিব অলঙ্কাব প্রয়োগের সমধিক কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে শ্লেষ ও ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের দুইটি বিশিষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্লেষ:

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

ব্যাজস্তুতি:

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥

ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার-প্রয়োগনৈপুণ্য এত সার্থক যে বাংলা অলঙ্কারগ্রন্থসমূহে নানাপ্রকার অলঙ্কারের নমুনা ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতেই উদাহৃত হইয়া থাকে।

ভারতচন্দ্রের যেসব উক্তি এখনও প্রবচন হিসাবে আমরা সর্বদা ব্যবহার করি তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই দৃষ্টান্ত-আহরণে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে অন্তর্ভুক্ত না করিয়া উপায় নাই।

(ক) নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়
(খ) ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন
(গ) বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
(ঘ) যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন
(ঙ) হাবাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
(চ) একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
(ছ) ভেকে ভুলাইয়া ভৃঙ্গ পদ্মমধু খায়
(জ) মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন
(ঝ) বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির
(ঞ) নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে
(ট) মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে
(ঠ) ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্তমানে মরে।
(ড) প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে॥

ভারতচন্দ্রের কাব্যের সর্বত্র কৌতুকপ্রিয়তা ও এক বিশেষ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাহা অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে খুব বেশী পরিদৃষ্ট হয় না। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে 'শিববিবাহ', 'কন্দল ও শিবনিন্দা', 'শিবের মোহনবেশ', 'হর-গৌরীর বিবাদ সূচনা', 'হরগৌরীকন্দল' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় ভারতচন্দ্রের কৌতুক-প্রিয়তা বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে।

যুগসন্ধির-কবি: ভারতচন্দ্রকে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই যুগসন্ধির কবি বলা হইয়া থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের যে ধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল ভারতচন্দ্রের পূর্বেই তাহার গতি প্রায় রুদ্ধ হইয়া যায়। ভারতচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার গুণে একথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, মরা-গাঙ্গে আর বান ডাকিবে না। তাই তিনি মঙ্গলকাব্যের ঐ বিশুষ্ক ধারাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ঐ প্রয়াসে তিনি অপরিসীম সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তৈল প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিলে প্রদীপ যেমন শেষবারের মত উজ্জ্বলতর হইয়া প্রদীপ্ত হয় ভারতচন্দ্রের কাব্যের ক্ষেত্রেও তাহাই

ঘটিয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের কাঠামোটি মাত্র গ্রহণ করিয়া ভারতচন্দ্র তাহাতে নূতন ভাব ও ভঙ্গীর অনুপ্রবেশ ঘটাইলেন এবং এই ভাবেই তাঁহার কাব্য মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যধারার অবসান সূচিত করিল।

অন্যদিকে ভারতচন্দ্র-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শ, ইহার রুচি ও প্রকৃতি পরবর্তী একশত বৎসরের বাংলা কাব্য-কবিতাকে প্রভাবিত করিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধ হইতে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত একশত বৎসর ধরিয়া বাংলা কাব্য-কবিতা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকে আদর্শ করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। কবিগান, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি লোকরঞ্জক মাধ্যমগুলি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজ-বণিককুলের সঙ্গে সম্পদাহরণে যে সকল বাঙ্গালী সন্তান যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অপরিমিত অর্থের প্রাচুর্য যেভাবে কলিকাতা নগরীতে বিলাসের পঙ্কিলস্রোত প্রবাহিত করাইয়াছিল তাহাতে নীতি বা রুচির কোন বালাই ছিল না। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এই রুচির সঙ্গে সুন্দর খাপ খাইয়া গিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার উদ্বোধন করিলেন তাহার প্রাক্কাল পর্যন্ত আমাদের অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যের উপর ভারতচন্দ্রের প্রভাব অপরিসীম। এমন কি মহাকবি মধুসূদন পর্যন্ত তাঁহার একটি সনেটের (অন্নপূর্ণার ঝাঁপি) বিষয়বস্তু ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে আহরণ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, ভারতচন্দ্রের বর্ণনাভঙ্গীও মধুসূদনকে প্রভাবিত করিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে হীরা মালিনীর খেদোক্তি এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এ কৈকেয়ীর খেদোক্তি প্রায় হুবহু এক। এইভাবে ভারতচন্দ্র পুরাতন ও নূতনের সন্ধিক্ষণে আপন মহিমায় ভাস্বর হইয়া রহিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ ও অন্নদামঙ্গল : বাংলা সাহিত্যের প্রায় জন্মলগ্ন হইতেই মঙ্গলকাব্যের অবির্ভাব ঘটিয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন হইলেও এইগুলির বক্তব্য এক। মঙ্গলকাব্যের রচনারীতি একটি গতানুগতিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। ঠিক কোন্ সময়ে বাংলা মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। বাংলাভাষার উন্মেষকাল হইতেই বাংলাদেশের গ্রাম্য কবিগণ কর্তৃক গান এবং ছড়ার আকারে বিভিন্ন ধর্মমূলক এবং ঐতিহাসিক কাহিনী রচিত হইয়া জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ রচয়িতা অথবা গায়েনের মুখে মুখে গীত হইয়া প্রচারিত হইতে থাকে। পরবর্তীকালে অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষিত কবির প্রতিভাস্পর্শে লোক-সাহিত্যের মঙ্গলতা

হারাইয়া এই কাহিনীগুলির বিশিষ্ট কাব্যসাহিত্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়া মঙ্গলকাব্য নাম গ্রহণ করিয়াছিল। বিবিধ পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত গান ও ছড়াই দুইটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া গাথাকাব্য ও মঙ্গলকাব্যের রূপ নেয়। এই সময়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত ব্যক্তিগণ পরস্পর-বিরোধী মতবাদ লইয়া অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে আপন আপন ধর্মভাব প্রচারের প্রভূত চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা বিভিন্ন ছোট বড ধর্মাশ্রিত গীতিকাহিনী রচনা করিয়া গীতের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট প্রচার করিত। এই সকল গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার। বিভিন্ন ধর্মান্তর্গত দেবদেবী অথবা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণকে লইয়া রচিত এই সকল কাহিনী সুর-সংযোগে সাধারণ জনসাধারণের মাঝে প্রচারিত হইত, তখন কাহিনীর অন্তর্গত মূল বক্তব্য তাহাদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিত। মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় রচিত এইরূপ গীতিমূলক কাহিনীই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।৮ জনগণের মঙ্গল বিধানের জন্য রচিত অথবা এক মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ করিয়া আরেক মঙ্গলবার পর্য্যন্ত একটি সম্পূর্ণ কাহিনী গীত হইত, এই কারণেই এই কাব্যগুলির মঙ্গলকাব্য নামকরণ হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যগুলি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হইত বলিয়াই গতানুগতিক হইয়া পডিয়াছিল। সাধারণ জনসমাজ যাহাতে সহজেই ভীত ও প্রভাবিত হয় সেইজন্য পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত দেবদেবীগণ ক্রুর, হিংস্র ও স্বার্থসিদ্ধি-পরায়ণ ছিলেন। আবার ভক্তের নিকট যথোচিত পূজা ও শ্রদ্ধা পাইলেই এই সকল দেবদেবীই পরম কারুণিকরূপে তাহাদের সকল প্রকার মঙ্গল-বিধানে তৎপর হইতেন। এইরূপেই মঙ্গলকাব্য গীত প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে ঐ বিশেষ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারিত লৌকিক দেবদেবীর কাহিনী লইয়াই এই কাব্যগুলি রচিত হইত। কিন্তু শ্রোতাদের সম্ভ্রমপূর্ণ আনুগত্য লাভের আশাতেই এই সমস্ত কাহিনীর অন্তর্গত লৌকিক দেবদেবীগণের লৌকিক নাম পাল্টাইয়া তাঁহাদের পৌরাণিক নামকরণ করা হইত এবং বিভিন্ন পুরাণ হইতে কিছু সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টিরহস্যের অবতারণা করিয়া তাঁহাদের পৌরাণিকত্বে আস্থা জন্মাইবার চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই কারণেই বিভিন্ন প্রকার

মঙ্গলকাব্যের যে সকল দেবতা পূজিত হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই লৌকিক। মহাকাব্যগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন হইলেও এইগুলির বক্তব্য এক হওয়ার দরুণ ইহাদের ভিতর কোনও বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে না। কোন বিশেষ দেবতার পূজা কি করিয়া পৃথিবীতে প্রচারিত হইল ঐ দেবতার মাহাত্ম্য এবং তাহাকে পূজা করিলে কিরূপ সুখ ও সমৃদ্ধিতে বাস করা যাইবে সমস্ত মঙ্গলকাব্যের এই একই বক্তব্য।

যে হানাহানি ও বিরোধের পটভূমিকায় মঙ্গলকাব্যের ক্রূরমনা ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ দেবকুলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যে পূজিতা দেবী তাঁহাদের সমগোত্রীয়া নহেন, যদিও এই দেবী পূর্ববর্তী যুগের মঙ্গলকাব্যে আরাধ্যা শান্তোগ্র দেবীরই পরিবর্তিত রূপ। ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ অবস্থাই বিরাজমান ছিল। যে সামাজিক পটভূমিকায় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর লৌকিক দেবকুলেব আবির্ভাব ভারতচন্দ্রের সময়কার সামাজিক অবস্থা তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের ছিল। অবশ্য ভারতচন্দ্রের অন্নদা বা অন্নপূর্ণা শান্তশ্রীসমন্বিত স্নেহময়ী মাতৃমূর্তির প্রতীক হওয়ার অন্য কারণও বিদ্যমান ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুত্থান এবং বৈষ্ণব প্রভাব এই কাব্যরসের অন্যতম। যুগের পরিবর্তনই দেবপ্রকৃতির এই পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হইয়াছিল।

মনসামঙ্গল, শিবমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনামূলক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাহিনী বিন্যাসে এই কাব্যগুলি যে বিশেষ গঠনরীতিকে আশ্রয় করিয়াছে তাহাকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) বন্দনা খণ্ড ;

(২) গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ;

(৩) দেবখণ্ড ;

(৪) নরখণ্ড।

'বন্দনাখণ্ডে' মঙ্গলকাব্যে বন্দিত বিশেষ দেবতা বা দেবীর বন্দনা গানের সহিত বেদ ও পুরাণোক্ত বিবিধ দেবদেবীর মহিমা কীর্তন করা হইত। 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' খণ্ডে সকল কবিই মঙ্গলকাব্য রচনার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গ্রন্থরচনার কারণ প্রদর্শনের পশ্চাতে দুইটি উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, সেই যুগে কবিগণ কাব্যরচনার সমস্ত

কৃতিত্ব অর্জনে দেবতাদের কৃপার উপরই নির্ভর করিতেন, তাই দেবতার নামাঙ্কিত ও আশীর্বাদপূত করিয়া তাঁহারই আদেশক্রমে কাব্যরচনা করিতেছেন এইরূপ মনে করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, দৈবাদেশে রচিত বলিয়া জানিলে তখনকার জনসাধারণ কাব্যটির বেশী সমাদর কবিত। কবি ও শ্রোতার ব্যক্তিগত আস্থা বা পুরুষকারের অভাবই এই স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গের অবতারণা করিত বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ খণ্ডে কবি আপন বংশ-পরিচয়, জন্ম-তারিখ, বাসস্থানের নাম প্রভৃতি সংযোজিত করিতেন। 'দেবখণ্ডে' প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল, সৃষ্টি-রহস্য বর্ণনা, দক্ষযজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণে সতীর আগমন, শিবনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ ও সতীর দেহত্যাগে ক্রুদ্ধ শিবকর্তৃক দক্ষযজ্ঞ নাশ ও শিবেব প্রলয় নৃত্য, হিমালয়ের গৃহে সতীর নবজন্মলাভ, মদন ভস্ম, উমাব তপস্যা ও শিবের সহিত বিবাহ, কৈলাস যাত্রা, শিব-গৌরী কোন্দল, প্রভৃতি পুবাণান্তর্গত শিবকাহিনীর লৌকিকরূপ। 'নরখণ্ডই' হইল কাহিনী অংশ। স্বর্গেব কোন দেবতা বা দেবী বিশেষ দেবতাকর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্যে আগমন করিয়া বিশেষ দেব বা দেবীর পূজার মাধ্যমে মর্ত্যে তাঁহাব মহিমা প্রচারে সহায়তা কবেন। তারপর তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। এই দেব-দেবীরা মর্ত্যের মানুষেব ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া মর্ত্যের মানুষেব মত সুখ-দুঃখ সহ্য কবিয়া যান। ইহার মধ্য দিয়া তৎকালীন যুগের সমাজের চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 'বাবামাস্যা' তাই প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যের আব একটি প্রচলিত সংস্কাব। বিপদগ্রস্ত নায়ক বা নায়িকা দেবতার আশীর্বাদ লাভ করিবার জন্য চৌত্রিশটি বর্ণকে আদ্যক্ষব বাখিয়া যে স্তব করেন, তাহাই 'চৌতিশা' নামে পরিচিত।

এই প্রধান লক্ষণগুলি ছাড়াও মঙ্গলকাব্যেব আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন পাকপ্রণালীর বর্ণনা, নারীদিগেব পতিনিন্দা, বিবাহাচার, বিশ্বকর্মার শিল্পকীর্তির বিস্তৃত বর্ণনা, বাংলাদেশেব সওদাগরগণের বাণিজ্যযাত্রা, নগরবর্ণনা, প্রহেলিকা বা ধাঁধাব সমাধানান্তে কোনও রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ, যুদ্ধবর্ণনা, দেবীর বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া নায়ক-নায়িকাকে ছলনা এবং নায়কের শাস্তি বর্ণনাপ্রসঙ্গে মশান বা শ্মশানের উপস্থাপনা প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সেইযুগের মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণ উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে অনুসরণ করিয়া আপন আপন কাব্য রচনা করিতেন। এই কারণেই মঙ্গলকাব্য-গুলি গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল এবং বিচিত্র রসাবেদনের অভাবে ইহাদের

সমাদরও কমিয়া আসিতেছিল। ভারতচন্দ্রই প্রথম এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নূতনত্বের আরোপ করিয়া মঙ্গলকাব্যের মরা গাঙ্গে জোয়ার ডাকাইলেন। অতি সাধারণ বস্তুকে অসাধারণের মহিমায় ভূষিত করা, বর্ণহীন একঘেঁয়েমির মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের মত চমৎকৃতির সৃষ্টি একমাত্র সার্থক প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। ভারতচন্দ্র এই প্রতিভার যথার্থ অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি মঙ্গলকাব্যের উপরিবর্ণিত সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইরূপে মূল কাঠামোকে বজায় রাখিয়া কাব্যকে 'নবরসতর' করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার সরস ভাষার কারুকার্যে মঙ্গলকাব্যকে নূতনরূপ দান করিতে গিয়া গ্রন্থোৎপত্তির গতানুগতিক কারণ বর্ণনার পরিবর্তে অন্নপূর্ণার বন্দনা সমাপনান্তে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গুণগান করিয়াছেন। বর্গীর উৎপাতে বাংলা বিপর্যস্ত। কৃষ্ণচন্দ্র ধার্মিক রাজা তবুও—

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়
বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥
নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধশান্তমতি॥

তখন ধার্মিক কৃষ্ণচন্দ্রের এই বিপদে দেবী অন্নপূর্ণা বা অন্নদার টনক নড়িল।

অন্নপূর্ণা ভগবতী মুরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিও ভয়।
এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস॥

স্বপ্নে দেবী আরও বলিলেন :—

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥

তখন—

সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর।
অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতর॥

এইরূপে গ্রন্থসূচনায় ভারতচন্দ্র যদিও মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ স্বপ্নাদেশকেই অবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু দেবীমাহাত্ম্য অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞাই যে তাঁহাকে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

দেবখণ্ড অংশে মূল কাঠামো বজায় রাখিয়া ভারতচন্দ্র পৌরাণিক ও লৌকিক শিব কাহিনীর বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনায় সাধারণ লক্ষণকে অতিক্রম করিয়া শিব ও অন্নপূর্ণার মানবিক রূপ চিত্রিত করিয়াছেন। তাই দেখি, অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনা ও বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার রূপবর্ণনায় পার্থক্য খুবই কম। তাঁহার কাব্যের সর্বত্র নগর ও রাজসভার জীবনের প্রভাব পড়িয়াছে। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তিনিই প্রথম এবং একমাত্র কবি যাঁহার কাব্যে নগরজীবনের চিত্র স্থান লাভ করিয়াছে। হর-গৌরীর সংসারের দুঃখময় চিত্র, বৃদ্ধ মহাদেবের সঙ্গে কুমারী গৌরীর পরিণয়, হরিহোড়ের পত্নীদের মধ্যে সতীনসুলভ বিবাদ প্রভৃতি চিত্রকে ঐ যুগের সমাজচিত্রের প্রতিফলন হিসাবে অঙ্কিত করিয়া তিনি নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রতিভাধর কবি বলিয়াই ভারতচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, মঙ্গলকাব্যের মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করিতে হইলে গতানুগতিক পন্থা অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে। তাই কাব্যের প্রারম্ভেই কবি বলিয়াছেন,

নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়॥

এই নূতনত্বের আরোপই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকে গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের ধারা হইতে পৃথক রাখিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের মূলগত বক্তব্যের সঙ্গে অন্নদামঙ্গলের বিস্তর পার্থক্য রহিয়াছে। তাই "নরখণ্ড"-এর বর্ণনায় গতানুগতিক ভাবে স্বর্গের দেবতা বা দেবীর শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্যে আগমন ও পূজা প্রচারের বর্ণনা না করিয়া কবি মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ব্যতিক্রম আনিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা যেন তেন প্রকারে তাঁহাদের পূজা-প্রচারে ব্যস্ত। তাঁহাদের পূজায় যে রাজী হইবে না তাহাকে জব্দ করিবার জন্য এই দেবতারা সদসৎ যে কোন পন্থা অবলম্বনে পশ্চাদপদ নহেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এই জাতীয় কোন ঘটনা নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতচন্দ্র শুধু মঙ্গলকাব্যের কাঠামোটিকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার গতানুগতিক সূক্ষ্ম সাধারণ লক্ষণগুলিকে অনুসরণ করেন নাই। পুরাণো কাঠামোতে নিজের রুচি এবং তাঁহার নিজস্ব বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটাইয়াছিলেন। কাজেই সংজ্ঞা বিচারে অন্নদামঙ্গল খাঁটি মঙ্গলকাব্য নহে।

'মঙ্গল' জাতীয় মহাকাব্য : রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বাংলা মঙ্গলকাব্য-ধারার শেষ যুগের কবি। বাংলা সাহিত্যের প্রায় জন্মলগ্ন হইতেই মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন হইলেও এইগুলির বক্তব্য এক। কোন বিশেষ দেবতার পূজা কি করিয়া পৃথিবীতে প্রচারিত হইল, ঐ দেবতার মাহাত্ম্য এবং তাঁহাকে পূজা করিলে কিরূপে সুখ ও সমৃদ্ধিতে বাস করা যাইবে সমস্ত মঙ্গলকাব্যেরই এই বক্তব্য। বিভিন্ন প্রকার মঙ্গলকাব্যে যে সকল দেবতা পূজিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই পৌরাণিক দেবতা নহেন, তাঁহাদের অনেকেই লৌকিক। এই সকল দেবতার মধ্যে বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাদের উদার ও কারুণিক রূপের পরিবর্তে নীচ, ক্রূর প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ভয়ানক স্বার্থপর রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্ত যেমন নিত্য প্রয়োজনে তাঁহাদিগকে কাজে লাগায় তাঁহারাও তেমনি ভক্তের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া নেন। একটু ত্রুটি ঘটিলেই সর্বনাশ। ভক্তকে যখন তাঁহারা ধনে-প্রাণে সংহার করেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমরা এই সকল ভীষণ প্রকৃতির দেবতার সাক্ষাৎ পাই। পরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এই সকল ক্রূরমনা দেবতা শান্ত ও করুণাময় হইয়া পড়িলেন। উগ্রা চণ্ডী শেষ পর্যন্ত অভয়দাত্রী ও অন্নদাত্রী অভয়া ও অন্নদায় পরিণত হইলেন। যুগের পরিবর্তনই দেবীপ্রকৃতির এই পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তাই দেবীর শান্ত, করুণাময়ী রূপ দেখিতে পাই। মঙ্গলকাব্যের সৃজন কালে এই কাব্য রচনার উদ্দেশ্য ছিল দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া জনসাধারণকে এই দেবীর প্রতি আকৃষ্ট করা। কিন্তু যখন সে প্রয়োজন ফুরাইল তখন মঙ্গলকাব্য ঐ বিশেষ উদ্দেশ্যবর্জিত হইয়া কেবলমাত্র কাব্য রস সৃষ্টির জন্যই রচিত হইতে লাগিল। এই কারণেই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বিশেষ উদ্দেশ্য বিবর্জিত হইয়া একটি বিশুদ্ধ মঙ্গলজাতীয় মহাকাব্যের মর্যাদা পাইবার উপযোগী হইয়াছে। মহাকাব্যে কোন একটি বিশেষ বংশ বা চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া সেই বিশেষ যুগের পটভূমিকায় একটি কাহিনী স্থান পায়। এই কাহিনীর মাধ্যমে সমগ্র জাতির রুচি ও ভাবধারার প্রতিফলন হয়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের মাহাত্ম্য কীর্তনোদ্দেশ্যে রচিত। অন্নদামঙ্গলে অন্নদার কাহিনী নবদ্বীপাধিপতিদের ধর্মপ্রবণতা ও সততার এবং দেবীর কৃপালাভের বর্ণনায় সমৃদ্ধ। মঙ্গলকাব্যের দেবতা যেন তেন

প্রকারেণ মর্ত্যে আপনার পূজা প্রচারের জন্য ব্যস্ত। এইজন্য মঙ্গলকাব্যের বীর, শক্তিধর অথবা অন্যদের পূজক নায়কও ভয়ে অথবা সম্পদের লোভে দেবতার পূজায় স্বীকৃত হইয়াছেন। সমাজে প্রতিপত্তিশালী নায়কের পূজার সঙ্গে সঙ্গেই জনসমাজ আদরে সেই দেবতাকে মানিয়া লইয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল মঙ্গলকাব্যের কাঠামোর অনুকরণে দেবদেবী-বন্দনা ও সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়া আরম্ভ হইলেও, এখানে দেবীর ছলে, বলে, কৌশলে পূজা আদায়ের চেষ্টা নাই। তাই দেখি 'গ্রন্থসূচনা' অংশে অন্নদাদেবীর স্তব দিয়া কাহিনীব আরম্ভ করিতে গিয়া কবি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশ-পরিচয় ও তাঁহার গুণগান করিয়াছেন। কেবলমাত্র রচনাকে মঙ্গলকাব্যের গঠনপ্রণালী সম্মত রাখিবাব জন্য দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কবি কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার পরিচয় দিয়া কাব্যটিতে জাতির একটি সমগ্র রূপ ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

বর্গি মাহ.রাষ্ট্র আর সৌবাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তব সৈন্য বিকৃতি আকৃতি ॥
লটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বন্ধি নৌকার জাঙ্গাল ॥

বাংলাদেশের যখন এই অরাজক অবস্থা তখন কেহই শান্তিতে থাকিতে পারিল না।

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তব ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায় ॥
নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহরাজ শুদ্ধ শান্ত মতি ॥

এমন যে ধার্মিকপ্রবর মহারাজ তিনিও এই অশান্তি জালে জড়াইয়া পড়িলেন। ধার্মিক রাজার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তখন,

অন্নপূর্ণা ভগবতী মূবতি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া ॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয় ॥

* * *

সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায় ॥

তাহা হইলে দেখা গেল দেবীকে তাঁহার পূজা প্রচারের জন্য ভক্তের প্রতি অনুনয় বা ভীতি কোন কৌশলই প্রদর্শন করিতে হইল না এইখানেই অন্নদামঙ্গল কাব্যের মঙ্গলকাব্যগত একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অভাব।

ইহার পরই দেখি 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা' অংশে রাজার বংশ মহিমা ও সভাসদ মহিমা কীর্তন। এই অংশে সেই যুগের কিছু ঐতিহাসিক নাম ও রাজসভার বর্ণনা প্রসঙ্গে যুগরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপে মঙ্গলকাব্যগত বৈশিষ্ট্য হারাইয়া কাব্যটি মহাকাব্যগত বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

অতঃপর মঙ্গলকাব্যের প্রথানুযায়ী দেবী-সংক্রান্ত কিছু পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর সমাবেশ। শিব-দুর্গার বাস্তব গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কনে ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ভঙ্গীই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্নদাদেবীর বর্ণনায় কোথায়ও ভক্তকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া পূজা আদায়ের চেষ্টা দেখা যায় না। কাব্য-কাহিনীর ঘটনাগুলি শিব ও অন্নদাকে লইয়াই রচিত। সেখানে ভক্তের কোন উল্লেখ নাই। অবশেষে দেবী কিরূপে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন তাহার বর্ণনাতেই অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মঙ্গলকাব্যের প্রথানুযায়ী অন্নদামঙ্গলে দেবীর পূজককে নায়ক হিসাবে কাব্যের সর্বত্র স্থান দেওয়া হয় নাই। এমন কি এই কাব্যের নায়ক কে তাহাই নির্ধারণ করা যায় না। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের নায়কগণ উজ্জ্বল চরিত্রের মহিমায় সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু অন্নদামঙ্গলে তাহা দেখিতে পাই না। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের গঠনগত বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কাহিনী-বর্ণনাগত বৈশিষ্ট্য তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায় না। এই কাব্যের সর্বত্র সেই বিশেষ যুগরুচির প্রতিফলন ও হরিহোড় ঈশ্বরী পাটনীর ন্যায় কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন প্রকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অঙ্কন করিয়া কাব্যটিকে তিনি মহাকাব্যের মর্যাদা দান করিয়াছেন। অবশ্য অন্নদামঙ্গলে মহাকাব্যোচিত সকল বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে না। এই কারণে ইহাকে একটি বিশুদ্ধ মহাকাব্যও বলা যায় না। মঙ্গলকাব্যের গঠনভঙ্গী লইয়া ইহা মহাকাব্যের ভাবগত বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। এই কারণেই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যকে ঠিকমত বিচার করিলে মঙ্গলকাব্য বলা যায় না। ইহাকে মঙ্গলজাতীয় মহাকাব্য বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

রাজসভার কবি : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিভিন্ন ধারা লক্ষিত হয়। মঙ্গলকাব্য এই বিভিন্ন ধারার অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের একটি সুবিপুল সময়কাল ব্যাপিয়া এই মঙ্গলকাব্যের অবস্থান। এই সময়কালকে মূলতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবযুগ বলিয়া অভিহিত করা যায়। দ্বিতীয় যুগের বিস্তৃতি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। মঙ্গলকাব্যগত বৈশিষ্ট্য ও বর্ণনার ঔজ্জ্বল্যে এই যুগের মঙ্গলকাব্যগুলি একটি বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। এই যুগকে সৃজনযুগ বলিয়া অভিহিত করিলে তাহার পরবর্তী যুগকে মঙ্গলকাব্যের অন্তিমযুগ বলা যায়। এই যুগে মঙ্গলকাব্য তাহার রচনাব উদেশ্য বর্জিত হইয়া বিশুদ্ধ কাব্যরসে সিক্ত হইয়া রচনাগুলিকে কাব্যসৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্য এই যুগকে মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য যুগ বলিতেও বাধা নাই। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত।

এই সকল যুগের মঙ্গলকাব্যই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া বিশেষ একটি কাঠামোর ভিত্তিতে রচিত। মঙ্গলকাব্য conventional. সকল কবিই ঐ বিশেষ কাঠামোটিকে অবলম্বন করিয়া কাব্যের সূচনা করিয়াছেন। প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই প্রধানত: চারিটি ভাগ লক্ষ্য করা যায় বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। বন্দনা অংশে সকল পৌরাণিক দেবদেবীর স্তুতি করিয়া কাব্যকাহিনীর অন্তর্গত দেবতা বা দেবীর বন্দনাগান। 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণে' দেখা যায় দেবীর স্বপ্নাদেশই কবিকে গ্রন্থরচনায় প্রেরণা জোগাইয়াছে। এই অংশেই কবি আপন বংশপরিচয়. জন্ম-তারিখ, আবাসস্থলের ।বরণ প্রদান করিয়াছেন। 'দেবখণ্ডের' আলোচ্য হইল সৃষ্টি রহস্য, দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়-গৃহে নররূপে জন্মলাভ, মদনভস্ম, উমার তপস্যা, বিবাহ, কৈলাসযাত্রা, শিব-গৌরী কোন্দল প্রভৃতি পৌবাণিক শিব-কাহিনী।

'নরখণ্ড'-এ মূল কাহিনীব বর্ণনা। স্বর্গের কোন দেবতা বা দেবী বিশেষ দেবতার পূজাপ্রচারোদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্যে আসেন। দেবী বা দেবমাহাত্ম্য প্রচার ও পূজা সমাপনান্তে তাঁহারা স্বর্গে ফিরিয়া যান। কাহিনীর নায়ক-নায়িকা শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্যে দেবতা বা দেবীর নিকট হইতে ছলে, বলে, কৌশলে কি করিয়া ঐ বিশেষ দেবতা আপনার পূজা গ্রহণ করেন তাহারই বর্ণনায় মূল কাহিনী অংশ সমৃদ্ধ।

মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাকপ্রণালীর বর্ণনা, নারীদিগের পতিনিন্দা, বিবাহাচার, বিশ্বকর্মার শিল্পকৃতির বিস্তৃত বর্ণনা, বাংলার

সদাগরগণের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা, নগর বর্ণনা, প্রহেলিকা বা ধাঁধা, যুদ্ধ বর্ণনা, দেবীর বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া নায়ক-নায়িকাকে ছলনা এবং মশান বা শ্মশান বর্ণনা। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এই বিশেষ কাঠামোর অনুসরণ লক্ষিত হইলেও মঙ্গলকাব্য রচনার চিরাগত উদ্দেশ্যের সন্ধান ইহাতে মিলে না। ইহার ভাবধারাও সম্পূর্ণ নূতন। কাব্য-রস সৃষ্টিই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাঁহার মুখে শুনি—

"নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।"

ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভাকবি ছিলেন। কাব্যরচনাকালে তিনি রাজা ও রাজসভাসদদের তুষ্টিবিধানের কর্তব্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। উপরন্তু তিনি সমাজ ও যুগ সচেতন কবি। তাঁহার পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণ দেবনির্ভরতার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহাদেব বর্ণিত নরনারী দৈবপ্রভাবিত। একমাত্র চাঁদসদাগব ব্যতীত অন্য কাহারও পুরুষকার লক্ষিত হয় না। দেবতাব কৃপাই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাঁহার ব্যতিক্রম না ঘটিলেও এখানে আমবা বাস্তব সচেতনতা লক্ষ্য করিয়া থাকি। দেবতার অপার কৃপা লাভ করিয়াও এখানে মানুষ বাস্তব জগৎকে ভুলিয়া যায় নাই। তাই ভারতচন্দ্রের অপূর্বসৃষ্টি ঈশ্বরী পাটনী দেবতার নিকট অযাচিত অনুগ্রহ লাভ করিয়াও বলে—

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

আপন কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধেও ভারতচন্দ্র যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই মঙ্গল-কাব্যের প্রথানুযায়ী দেবীর স্বপ্নাদেশে কাব্যবচনার ইঙ্গিত কাব্যের সূচনা দিয়াও তিনি বলিতেছেন—

"যা হোক তা হোক ভাষা, কাব্য রস লয়ে।"

তাঁহার কাব্য যে বসসিক্ত হইবে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন বলিয়াই তিনি এইরূপ মন্তব্য করিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য মঙ্গলকবিরা কেহই একথা বলিতে পারেন নাই। কারণ বাঁধাধরা পথের বাহিরে আসিবার শক্তি বা সাহস কাহারও ছিল না। রাজসভাকবি ভারতচন্দ্র জানিতেন যে, শিক্ষিত ও রসজ্ঞ রাজসভাসদগণ তাঁহার কাব্যের রসাস্বাদন করিবেন। গতানুগতিক বর্ণনায় তাহাদের তৃপ্ত করা সম্ভবপর। আপন কবিত্বশক্তির উপর ভারতচন্দ্র যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন, তাই তিনি নির্ভীক কণ্ঠে বলিতে পারিয়াছেন,

"নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।"

কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞাকে স্মরণের মণিকোঠায় রাখিয়া পুরাতন কাঠামোর আধারে নূতন রসসিক্ত করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। তাই তাঁহার কাব্যে দেখি প্রথানুগত্যের প্রতি অস্বীকৃতি, নূতনের উদ্বোধন, যুগরুচির প্রতিফলন, সর্বপ্রথম নাগরিক জীবনের সার্থক চিত্রলিপি, শ্লেষকৌতুকপূর্ণ এক তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির পরিস্ফুটন। সর্বোপরি যুক্ত হইয়াছে কবির সুগভীর পাণ্ডিত্য। ছন্দ-অলঙ্কারের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য, বর্ণনার পারিপাট্য ও উজ্জ্বল চিত্ররূপ প্রতিফলনে সমৃদ্ধ অন্নদামঙ্গল কাব্য শিক্ষিত সমাজের বিশেষ আদরণীয় হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে।

রাজকণ্ঠের মণিমালা : ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার কবি ছিলেন। তিনি মঙ্গলকাব্যধারার অন্তিম লগ্নের কবি। অতি সাধারণ বস্তুকে অসাধারণত্বের মহিমায় ভূষিত করা, বর্ণহীন একঘেঁয়েমির মধ্যে বিদ্যুৎঝলকের মত চমৎকৃতির সৃষ্টি একমাত্র সার্থক প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। ভারতচন্দ্র এই প্রতিভার যথার্থ অধিকারী ছিলেন। বাংলাসাহিত্যের প্রায় জন্মলগ্ন হইতেই মঙ্গলকাব্যের বিজয়াভিযান আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই অভিযানের গৌরবের প্রায় সবটুকুই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বিষয়বস্তু এবং বর্ণনারীতি এই উভয়ের কোন প্রকার বৈচিত্র্য না থাকায় জনচিত্তে মঙ্গলকাব্যের আর কোন আবেদন ছিল না। ভারতচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক এক ঘেঁয়েমিই বাঙ্গালীচিত্তে বিতৃষ্ণা জাগাইয়াছে। তাই তিনি তাঁহার সহজাত প্রতিভাস্পর্শে বাংলা সাহিত্যের এই মৃতপ্রায় শাখাটিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন। পুরাতন কাব্যকাঠামোতে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহা এই অন্তিমদশাপ্রাপ্ত কাব্যধারার মধ্যে নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল। কবির অনন্যপূর্ব শিল্পচাতুর্য এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশেষ মাধুর্যরসের আবেদন আনিয়াছিল।

ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে পুরাতন বস্তুকে নূতন আধারে পরিবেশন করিয়াছেন। পুরাতন আধারের চিরপরিচিত সৌন্দর্য মানুষকে আর মুগ্ধ করিতে পারিতেছে না এই উপলব্ধির ভিত্তিতে তিনি নূতন আধার নির্মাণ করিয়া মঙ্গলকাব্যের জীর্ণ দেহে প্রাণসঞ্চার করিলেন। তাঁহার প্রতিভার আলোক স্পর্শে মঙ্গলকাব্য-প্রদীপের ম্লান আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তিনি "নূতন" মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি করিলেন। নূতন কাব্যের ভাষাও তাঁহার লেখনীস্পর্শে সরস হইয়া উঠিল—

"নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় ॥"

ভারতচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে সরস ভাষাই কাব্যের প্রাণ তাই,

পড়িয়াছি যেইমত লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবাবে ভারি ॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥)

ভারতচন্দ্রের কাব্যে বন্দিতা দেবী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহপরায়ণা। সুতরাং এই দেবীর পূজার্চনা রাজসিকরূপেই হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাজপূজ্যা দেবীর বন্দনাগানে ভারতচন্দ্রের ভাষা স্বভাবতঃই উজ্জ্বল ও আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভারত শিব ও অন্নপূর্ণাকে সমসাময়িক-কালে মানবীয় রূপ প্রদান করিয়াছেন। তাই দেখি, অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনা ও বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার রূপ বর্ণনাব পার্থক্য খুবই কম। (ভাবতচন্দ্রের কাব্যে নগর ও রাজসভার জীবনের ছাপ সুস্পষ্ট। ঐ জীবনের রুচি ও রূপেরই তিনি প্রধান কারবারী। নগব-জীবনেব প্রতিনিধি বলিয়াই ভাবতচন্দ্রের ভাষা এত মার্জিত এবং অলঙ্কারবহুল হইতে পারিয়াছে। তদুপবি সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকায় তাঁহাব কাব্য শিল্পচাতুর্যেব উৎকৃষ্ট নিদর্শন হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু বলাই বাহুল্য তাঁহার কাব্যেব সহিত সাধারণ জীবনের যোগ অতি অল্প। কিন্তু তাঁহার শিল্পচাতুর্য এই সকল ত্রুটিকে ঢাকিয়া দিয়াছে।) ভারতচন্দ্রের শিল্পচাতুর্যের সামগ্রিক বিচারে বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। কারণ এই অংশেই কবির শিল্পদক্ষতার সর্বাপেক্ষা অধিক নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কারণেই বিদ্যাসুন্দরকে আলোচনার বাহিবেই রাখিতে হইবে। তবে অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডেও ভারতচন্দ্রেব ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রবচনবহুল বাগ্‌ভঙ্গীর প্রচুর সমাবেশ লক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে অন্নদামঙ্গল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনই তাহার কারুকলি।" বলা বাহুল্য কবির এই উক্তিকে আমরা অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড সম্পর্কেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে করি।

(ভারতচন্দ্রের শিল্পচাতুর্যের পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহার ছন্দোবদ্ধ এবং অলঙ্কারবহুল কাব্যধারার কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। ভারতচন্দ্রের পূর্বে বাংলাকাব্যে ছন্দ-বৈচিত্র্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। পয়ার, ত্রিপদী ছাড়া বাংলা কাব্য ইতিপূর্বে অন্য কোন ছন্দে রচিত হয় নাই। ফলে এই ছন্দ একঘেঁয়ে হইয়া

পড়িয়াছিল। ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যকে সরস করিবার জন্য ছন্দে বৈচিত্র্য আনিলেন। ভাবানুযায়ী ছন্দ-নির্বাচনেই যে তিনি শুধু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এমন নয়, এই ছন্দকে তিনি সার্থক শব্দ-সমষ্টির মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার শব্দ নির্বাচন বা শব্দলীলা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যেরই ফলশ্রুতি। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী এই সব রকমের শব্দই তাঁহার কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সতীর দেহত্যাগের সংবাদে বিচলিত শিব দক্ষালয়ে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বিষাদ-ক্ষুব্ধচিত্তের সম্যক প্রকাশ ঘটাইবার জন্য কবি সংস্কৃত ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ট জটাজূট্ট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥

শব্দের ঘনঘটা মহাদেবের রুদ্ররূপটিকে অতি সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

ভূতপ্রেতগণ দক্ষযজ্ঞনাশে মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের উন্মত্ত কলরোল কবি তূণক ছন্দের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥

এই সকল ছন্দ যেমন ভাবানুযায়ী সার্থক হইয়াছে তেমনি উহাতে ব্যবহৃত শব্দাবলী প্রয়োগনৈপুণ্যে অতিশয় অর্থবহ হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম উদাহরণে গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গলীলা এবং দ্বিতীয় উদাহরণে ভূতপ্রেতগণের নৃত্যের উন্মত্ততা যেন উপযোগী রাগিণীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ-ব্যবহারে ভারতচন্দ্রের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। দেবী অন্নদা শিবকে অন্নদান করিতেছেন, ভোজনের আনন্দে শিব মাতিয়া উঠিয়াছেন,

পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাদের মত॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক পর্ব্বত কচমচিয়া॥

চুহু চুহু চুহু চুষ্য চুষিয়া ॥
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া ॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া ॥

একাবলী ছন্দে রচিত এই বর্ণনাটির অন্য গুণ না থাকিলেও ভাবানুযায়ী সার্থক হইয়াছে বলিতেই হইবে।

অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে এমন কতকগুলি কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, ভাবে ও বর্ণনার গুণে যেগুলি গীতিকবিতার পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। এই কবিতাগুলিতে কবির-আত্মগত তন্ময় ভাব স্বভাবতই পাঠকের মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি করে। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে মন্তব্যটির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। কৈলাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস ॥

* * * *

তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফুলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত ॥
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে ॥

অথবা, 'অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান' কবিতায়—

কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে
বসিলা অন্নপূর্ণা মনিদেউলে।
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢলঢল উছলে কুলে ॥

অন্যত্র,

ঘরে ঘরে নানা যন্ত্রে বসন্তের গান।
সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্তিমান্॥
শুষ্ক তরু শুষ্ক লতা রঙ্গেতে মুঞ্জরে
মঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে॥

অথবা সেই প্রসিদ্ধ "অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা" কবিতা। এই কবিতাটিতে জগজ্জননী ও সন্তানের মধুর রহস্যপূর্ণ সংলাপে ভারতচন্দ্র যেন তাহার পাণ্ডিত্যের কৃত্রিমতার আবরণখানি ফেলিয়া দিয়া মাতৃস্নেহভিক্ষু সনাতন বাঙ্গালী সন্তানে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার কাব্যে যে জীবন-রসের একেবারে অসদ্ভাব নাই তাহা এই কবিতাটিতে বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' পাটনীর এই উক্তির মধ্য দিয়া ভারতচন্দ্র ঐ যুগের বাঙ্গালী-হৃদয়ের কামনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, উপমা, শ্লেষ, রূপক, ব্যাজস্তুতি, ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তরন্যাস, অসঙ্গতি ও স্বভাবোক্তি অলঙ্কারই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বিদ্যাসুন্দর কাব্যেই কবির অলঙ্কার প্রয়োগের সমধিক কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড হইতে শ্লেষ ও ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের দুইটি বিশিষ্ট উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

শ্লেষ :

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥

ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার-প্রয়োগনৈপুণ্য এত সার্থক যে, বাংলা অলঙ্কার গ্রন্থসমূহে ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে নানা প্রকারের অলঙ্কারের নমুনা উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

ভারতচন্দ্রের কতকগুলি উক্তি এখনও প্রবচন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দর অংশেই এই ব্যবহার বেশী দেখা যায়।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের সকল ক্ষেত্রে কৌতুকপ্রিয়তা ও এক বিশেষ্ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে এই বৈশিষ্ট্য খুব বেশী পরিদৃষ্ট হয় না। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে 'শিববিবাহ', 'কন্দল ও শিবনিন্দা,' 'শিবেব মোহন বেশ,' 'হরগৌরীর বিবাদ সূচনা,' 'হরগৌরী-কন্দল' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় ভারতচন্দ্রের কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এইরূপে বিচিত্র রসে ও অলঙ্করণে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এত উজ্জ্বল ও শোভাময় হইয়া উঠিয়াছে যে, রসজ্ঞ সমালোচক যে ইহাকে রাজকণ্ঠের মণিমালার সঙ্গে তুলনা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?

দেবচরিত্রের মহিমা তথা মনুষ্য চরিত্র : দেব মাহাত্ম্যমূলক আখ্যান-কাব্যই মঙ্গলকাব্য। স্বর্গ হইতে মর্ত্যে দেবগণের আগমন এবং মর্ত্যে তাঁহাদের মহিমা বিস্তারের কাহিনী ভক্তিগদগদ চিত্তে বর্ণিত হইয়াছে এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধারার উপর দেবীর অপার করুণা বর্ষণের কথাও বলা হইয়াছে। কাজেই অন্নদামঙ্গলকাব্যে মঙ্গলকাব্য রচনার সর্ত উপেক্ষিত হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের কাঠামোকে তাঁহার কাব্যেব মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মঙ্গলকাব্য যে দীর্ঘকালের একঘেঁয়েমিতে বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল তাহা ভারতচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'সরস' ভাষায় 'নূতন মঙ্গল' রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজদরবারের কবি। মুখ্যত: মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার দরবারের মনোরঞ্জনের দায়িত্ব ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া পালন করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা যাঁহারা আলোকিত করিতেন জীবনের কোন কিছুরই প্রতি তাঁহাদের আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। দেবদেবীর প্রতি তাঁহাদের ভক্তি কতটা ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। রাজসভার অনুগৃহীত কবির পক্ষে রাজা এবং তাঁহার সভাসদদের মনোরঞ্জন না করিয়া উপায় ছিল না। দেবদেবীর প্রতি সরল হৃদয়ের অকুণ্ঠ ভক্তি নিবেদন করিয়া যে লম্পট প্রকৃতির ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করা যায় না তাহা আশা করি ব্যাখ্যার অপেক্ষা করে না।

ভারতচন্দ্র মুখ্যত: তাঁহার আশ্রয়দাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তাহার কাব্যে যে দেবীর বন্দনা

গান গীত হইয়াছে সেই দেবী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ-পরায়ণা। মহারাজ সেই দেবীর পূজার্চনার রাজসিক ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন। এইরূপ দেবীর বন্দনা গানে ভারতচন্দ্রের ভাষা যে স্বভাবতই উজ্জ্বল ও আড়ম্বরপূর্ণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভারতচন্দ্রের শিব ও অন্নপূর্ণা ঐ যুগের মানবিক বেশ ধারণ করিয়াছেন। তাই দেখি, অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনা ও বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার রূপবর্ণনার পার্থক্য অতি অল্পই। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর কথা উল্লেখ করিতে পারি। রাধা ও কৃষ্ণের পবিত্র প্রেমলীলাকে অবলম্বন করিয়া উক্ত কাব্যে যে ভাবে মানুষের আদি রিপুর চর্চা করা হইয়াছে তাহাতে দেবভক্তি কি পরিমাণ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পল্লী বাংলার আসরে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ধামালীরূপে গীত হইত। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের উন্নত সংস্করণ মাত্র। আসলে দেবতার প্রতি ভক্তি-নিবেদন, জনগণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পবিত্র 'মঙ্গল' সঙ্গীত পরিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমের দণ্ড ধরিয়া ভারতচন্দ্র রাজা এবং রাজানুচরবর্গের বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে চেতাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। ফলে তিনি যে সব দেবচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে মনুষ্যচরিত্রের প্রতিভাস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বৃদ্ধ বর দেখিয়া মেনকার যে বিলাপ এবং নারদকে গালাগালি করা তাহাতে দেবচরিত্রের মহিমা কোথায়? শিবের শ্লথ চরিত্র লইয়া গৌরীর ঠাট্টা, বরবেশী বুড়া শিবের উলঙ্গ মূর্তি দেখিয়া নারীদের মধ্যে আলোড়ন, অন্নদার জরতী বেশ প্রভৃতি চিত্রগুলিতে অলৌকিক স্বর্গধামের মহিমা অন্বেষণ বৃথা। ঈশ্বরী পাটনী তো অন্নদামঙ্গলের সার্থক মনুষ্যচরিত্র। ভারতচন্দ্রের কাব্য রচনার উদ্দেশ্য অবগত হইলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, দেবলীলার পটভূমিকায় মরজগতের কাহিনী বিস্তারই ছিল তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই তাঁহার কাব্যে দেবচরিত্রের মহিমা অপেক্ষা মনুষ্যচরিত্রই যে অধিকতর সজীব হইবে তাহাতে সন্দেহ কোথায়!

মঙ্গলকাব্যের ভক্তিগত প্রেরণা: (অন্নদামঙ্গলকাব্য রচনা করিতে গিয়া ভারতচন্দ্র অবশ্যই এই কাব্যধারার অতীত যুগের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন। নূতন বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়া ই কাব্যধারায় যে নূতনত্বের প্রবর্তন করা সম্ভব নয় তাহা তাঁহার মত শিল্পসচেতন কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই।) যে ভক্তিমূলক মনোভাব হইতে মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি সেই ভক্তির স্রোত যে বহুকাল পূর্বেই শুরু হইয়া গিয়াছিল তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তাই অন্নদামঙ্গলে শিল্পসুষমার চমৎকৃতির দ্বারা তিনি বিষয়বস্তুর একঘেঁয়েমির ক্ষতিপূরণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

দেবমাহাত্ম্যমূলক আখ্যানকাব্যই মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে দেবগণের আগমন এবং মর্ত্যে তাঁহাদের মহিমাবিস্তারের কাহিনী ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে বর্ণিত হইয়া থাকে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধারার উপর দেবীর অপার করুণাবর্ষণের কথাও বলা হইয়াছে। কাজেই অন্নদামঙ্গল কাব্যে মঙ্গলকাব্য রচনার সর্ত উপেক্ষিত হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের কাঠামোকে তাঁহার কাব্যের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মঙ্গলকাব্য দীর্ঘকালের একঘেঁয়েমিতে বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তিনি 'সরস' ভাষায় 'নূতন মঙ্গল' রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

(ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজদরবারের কবি। মুখ্যতঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার দরবারের মনোরঞ্জনের দায়িত্ব ভাবতচন্দ্র তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া পালন করিয়াছেন।) কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা যাঁহারা আলোকিত করিতেন জীবনের কোন কিছুরই প্রতি তাঁহাদের ভক্তি কতটা ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। (রাজসভার অনুগৃহীত কবির পক্ষে রাজা এবং তাঁহার সভাসদদের মনোরঞ্জন না করিয়া উপায় ছিল না।) দেবদেবীর প্রতি সরল হৃদয়ের অকুণ্ঠ ভক্তি নিবেদন করিয়া যে লম্পট প্রকৃতির ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করা যায় না তাহা আশা করি ব্যাখ্যার অপেক্ষা করে না।

ভারতচন্দ্র তাঁহার আশ্রয়দাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের দিকে মুখ্যতঃ তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে যে দেবীর বন্দনা গীত হইয়াছে সেই দেবী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহপরায়ণা। মহারাজ সেই পূজার্চনার রাজসিক ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন। এইরূপ দেবীর বন্দনাগানে ভারতচন্দ্রের ভাষা যে স্বভাবতই উজ্জ্বল ও আড়ম্বরপূর্ণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভারতচন্দ্রের শিব ও অন্নপূর্ণা ঐ যুগের মানবিক বেশ ধারণ করিয়াছেন। তাই দেখি, অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনা ও বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার রূপবর্ণনার পার্থক্য অতি অল্পই। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর কথা উল্লেখ করিতে পারি। রাধা ও কৃষ্ণের পবিত্র প্রেমলীলাকে অবলম্বন করিয়া উক্ত কাব্যে যেভাবে মানুষের আদি রিপুর চর্চা করা হইয়াছে তাহাতে দেবভক্তি

কি পরিমাণ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। আসলে দেবতার প্রতি ভক্তি-নিবেদন, জনগণের মঙ্গলের উদ্দেশ্য পবিত্র 'মঙ্গল' সঙ্গীত পরিবেশন প্রভৃতি মাধ্যমের দণ্ড ধরিয়া ভারতচন্দ্র রাজা এবং রাজানুচরবর্গের বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে চেতাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। ফলে তিনি যে সব দেবচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে মনুষ্যচরিত্রের প্রতিভাস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বৃদ্ধ বর দেখিয়া মেনকার যে বিলাপ এবং নারদকে গালাগালি তাহাতে দেবচরিত্রের মহিমা কোথায়? শিবের শ্লথ চরিত্র লইয়া গৌরীর ঠাট্টা, বরবেশী বুড়া শিবের উলঙ্গ মূর্তি দেখিয়া নারীদের মধ্যে আলোড়ন, অন্নদার জরতীবেশ প্রভৃতি চিত্রগুলিতে অলৌকিক স্বর্গধামের মহিমা অন্বেষণ বৃথা। ঈশ্বরী পাটনী তো অন্নদামঙ্গলের সার্থক মনুষ্যচরিত্র। ভাবতচন্দ্রের কাব্যরচনার উদ্দেশ্য অবগত হইলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, দেবলীলাব পটভূমিকায় মরজগতের কাহিনী-বিস্তারই ছিল তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই তাঁহার কাব্যে দেবচরিত্রের মহিমা অপেক্ষা মনুষ্যচরিত্রই যে অধিকতর সজীব হইবে তাহাতে সন্দেহ কোথায়!

(এই সজীবতা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কবির সার্থক শিল্পপ্রতিভার গুণে। একেতো তিনি সহজাত শিল্পনৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন তদুপরি সংস্কৃত এবং ফাবসীভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি তাঁহাব কাব্যকে সবিশেষ রসাল করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তা, তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি, 'যাবনী মিশাল' ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কাবেব প্রয়োগ তাঁহার কাব্যকে অসাধারণ শিল্পমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।) ভারতচন্দ্রের যুগের জনসাধারণ মঙ্গলকাব্যের দেবমাহাত্ম্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিল না। ভাবতচন্দ্র সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তদুপরি তাঁহার কাব্য মনোরম শিল্পসুষমায় মণ্ডিত বলিয়া তাহাতে মঙ্গলকাব্যের ভক্তিগত প্রেরণার দিকটা পাঠকের দৃষ্টি একেবারেই এড়াইয়া যায়।

ঈশ্বরী পাটনী: অন্নদাতা প্রভু কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে দেবী অন্নদা কিভাবে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন তাহাই অন্নদামঙ্গল কাব্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। মর্ত্যধামে স্বীয় পূজা-প্রচারের উদ্দেশ্যে দেবী প্রথমে অভিশাপগ্রস্ত কুবের-অনুচর বসুন্ধরের মর্ত্য-সংস্করণ হরিহোডের ঘরে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরিহোড়ের গৃহে তিষ্ঠিতে না পারিয়া দেবী গঙ্গা পার হইয়া ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে যাইতে মনস্থ করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া পাটনীকে গঙ্গা পার করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। সেই পাটনীর নাম ঈশ্বরী। পরমা সুন্দরী কুলবধূকে একা দেখিয়া ঈশ্বরী পাটনী বিস্মিত হইল। তাই

সে সসম্মানে সেই রমণীকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিল। ঈশ্বরী পাটনী জানিত না যে, স্বয়ং জগদীশ্বরী আজ তাহাকে কৃপা করিতে আসিয়াছেন। অতঃপর আরম্ভ হইল সন্তানের সঙ্গে জগজ্জননীর মধুর রহস্যালাপ। সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যের মধ্যে এই অংশটিকে উজ্জ্বলতম রত্ন বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। রাজসভার চাতুর্য ও কৃত্রিমতা পরিহার করিয়া ভারতচন্দ্র এখানে জননীর নিকট স্নেহভিক্ষু সন্তানের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী চরিত্রের শাশ্বত বৈশিষ্ট্যটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেঁউতি সোনায় পরিণত হওয়ায় পাটনী বুঝিতে পারিল,

এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥

দেবী তীরে নামিয়া গজ গমনে পূর্বমুখে চলিতে লাগিলেন। তখন,

সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি ॥

পাটনীর চক্ষে তখন জলধারা। দুই হাত জোড় করিয়া সে কহিতে লাগিল,

সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥
হের দেখি সেঁউতীতে থুয়েছিল পদ।
কাঠের সেউঁতী মোর হৈলা অষ্টাপদ ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥

দেবী ইতিপূর্বে পাটনীকে রহস্যচ্ছলে যে পরিচয় দিয়াছিলেন মূর্খ পাটনী তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? দেবী তখন পাটনীকে তাঁহার পরিচয় খুলিয়া বলিলেন এবং তাহাকে

বর মাগো মনোনীত যাহ চাহ দিব ॥

ধন, জন, রাজ্যপাট যাহা খুসী পাটনী চাহিতে পারে। কালকেতুকে এই দেবীই এঁকুশ ঘড়া সুবর্ণ মোহর দিয়াছিলেন। ঈশ্বরী পাটনী ইচ্ছা করিলে তাহার চেয়ে আরও অনেক বেশী কিছু চাহিয়া লইতে পারিত। কিন্তু ঈশ্বরী পাটনীর আবেদন অতি অকিঞ্চিৎকর :

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥

বাৎসল্যরসের রসিক সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতিভূ পাটনী জগজ্জননীর কাছে যাহা চাহিল সমগ্র বাঙ্গালী জাতির তাহাই তো একমাত্র কামনা। বিশেষ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘোরতর মাৎস্যন্যায়ের যুগে সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ চিন্তায় বাঙ্গালী পিতা সবিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই ভারতচন্দ্র ঈশ্বরী পাটনীর মুখ দিয়া বাঙ্গালীর মর্মকথাটি যেন ব্যক্ত করিয়াছেন। আজিকার দিনেও ইহাই বাঙ্গালীর প্রাণের কথা। যিনি মাত্র একটি বাক্যে একটি জাতির মর্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন তিনিই তো সার্থক কবি।

[বাংলাদেশে মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রচলন হওয়ার পর ভারতচন্দ্রের কাব্যের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কৃত সংস্করণই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনাকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় নবাগত ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগকে ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়াইতেন। অতঃপর তিনি যখন প্রকাশন ব্যবসা আরম্ভ করিলেন তখন কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে রক্ষিত মূল পুঁথি দেখিয়া তিনি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে বিদ্যাসাগর-কৃত সংস্করণই অনুসৃত হইয়াছে। বর্তমান সংস্করণে আমরা তাহাই অনুসরণ করিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সুবিজ্ঞ সম্পাদকদ্বয় প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অন্যান্য সংস্করণের সঙ্গে বিদ্যাসাগর-কৃত সংস্করণ মিলাইয়া পাদটীকায় পার্থক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের এই ছাত্রপাঠ্য সংস্করণে তাহার কোন প্রয়োজন না থাকায় আমরা বিদ্যাসাগর-কৃত সংস্করণকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সম্পাদনে আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংস্করণ হইতে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য ঐ গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয়ের উদ্দেশে গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।]

অন্নদামঙ্গল

প্রথম খণ্ড

গণেশবন্দনা

গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম
পরমপুরুষ পরাৎপর।[১]
খর্ব্ব স্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরমসুন্দর॥
বিঘ্ন নাশ কর বিঘ্নরাজ।
পূজা হোম যোগ যাগে তোমার অর্চ্চনা আগে
তব নামে সিদ্ধ সর্ব্ব কাজ॥
স্বরগ পাতাল ভূমি বিশ্বের জনক তুমি
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল।
শিবের তনয় হয়ে দুর্গারে জননী কয়ে
ক্রীড়া কর হয়ে অনুকূল॥
হেলে শুণ্ড[২] বাড়াইয়া সংহার সমুদ্র পিয়া
খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুন কর বিশ্ব সৃষ্টি
ভাল খেলা খেল দয়াময়॥
বিধি বিষ্ণু শিব শিবা ত্রিভুবন রাত্রি দিবা
সৃষ্টি পুন করহ সংসার।
বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম তুমি জপ কোন্ ব্রহ্ম
তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার॥
যে তুমি সে তুমি প্রভু জানিতে না পারি কভু
বিধি হরি হর নাহি জানে।

১। শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ ২। শুঁড়

অন্নদামঙ্গল

তব নাম লয় যেই আপদ এড়ায় সেই
তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ[1] দানে ॥
আমি চাহি এই বর শুন প্রভু গণেশ্বর
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিব।
কৃপাবলোকন কর বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর
ইথে[2] পার তবে সে পাইব ॥
আপ'নি আসরে উর[3] নায়কের আশা পূর
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

শিববন্দনা

শঙ্করায় নমঃ নমঃ গিরিসুতাপ্রিয়তম[4]
বৃষভবাহন যোগধারী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন সুশোভিত ত্রিনয়ন
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি ॥
হর হর মোর দুঃখ হর।
হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ
হিমকরশেখর শঙ্কর ॥
গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধান বাঘছাল
হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়।
ডাকিনীযোগিনীগণ প্রেত ভূত অগণন
সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায় ॥
অতিদীর্ঘ জটাজূট কণ্ঠে শোভে কালকূট
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।

১। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ
২। ইহাতে
৩। উর—অবতীর্ণ হওয়া
৪। গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা গৌরীর পতি

ফণী বালা ফণী হার ফণিময় অলঙ্কার
শিরে ফণী ফণী উপবীত ॥
যোগীর অগম্য হয়ে সদা থাক যোগ লয়ে
কি জানি কাহার কর ধ্যান।
অনাদি অনন্ত মায়া দেহ যারে পদছায়া
সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান ॥
মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়াযুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
অজ্ঞান তাহার যায় অনায়াসে জ্ঞান পায়
যারে তুমি দেহ পদছায়া ॥
নায়কের দুঃখ হর মোর গীত পূর্ণ কর
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

সূর্য্যবন্দনা

ভাস্করায় নমঃ হর মোর তমঃ
দয়া কর দিবাকর।
চারি বেদে কয় ব্রহ্ম তেজোময়
তুমি দেব পরাৎপর ॥
দিনকর চাহ দীনে।
তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা
অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে ॥
বিশ্বের কারণ বিশ্বের লোচন
বিশ্বের জীবন তুমি।
সর্ব্ব দেবময় সর্ব্ব বেদাশ্রয়
আকাশ পাতাল ভূমি ॥
একচক্র রথে আকাশের পথে
উদয়গিরি হইতে।

যাহ অস্তগিরি এক দিনে ফিরি
কে পারে শক্তি কহিতে ॥
অতিশয় কর পোড়ে মহীধর
সিন্ধুর জল শুকায়।
পদ্মিনী কেমনে হাসে হৃষ্টমনে
তোমার তত্ত্ব কে পায় ॥
দ্বাদশ মুরতি গ্রহগণপতি
সংজ্ঞা ছায়া নারী ধন্যা।
শনি যম মনু তব অঙ্গজনু
যমুনা তোমার কন্যা ॥
বিশ্বের রক্ষিতা বিশ্বেব সবিতা
তাই সে সবিতা নাম।
তুমি বিশ্বসার মোবে কব পাব
করিএ কোটি প্রণাম ॥
কোকনদোপর থাক নিরন্তব
অশেষ গুণসাগর।
বরাভয় কর ত্রিনয়ন ধব
মাথায় মাণিকবর ॥
স্মরিলে তোমায় পাপ দূবে যায়
আসরে সদয় হবে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে চাহিবে স্বরূপে
ভারতচন্দ্রের স্তবে ॥

বিষ্ণুবন্দনা

কেশবায় নমঃ নমঃ পুবাণ পুরুষোত্তম
চতুর্ভুজ গরুড়বাহন।
বরণ জলদঘটা[১] হৃদয়ে কৌস্তুভছটা[২]
বনমালা নানা আভরণ ॥

১। ঘনমেঘের ন্যায় ২। কৃষ্ণের বক্ষোভূষণ; কৌস্তুভমণির কিরণ

কৃপা কর কমললোচন।

জগন্নাথ মুরহর[১] পদ্মনাভ গদাধর
মুকুন্দ মাধব নারায়ণ ॥
রাম কৃষ্ণ জনার্দ্দন লক্ষ্মীকান্ত সনাতন
হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠ বামন।
শ্রীনিবাস দামোদর জগদীশ যজ্ঞেশ্বর
বাসুদেব শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ সুশোভিত চারি ভুজ
মনোহর মুকুট মাথায়।
কিবা মনোহব পদ নিরুপম কোকনদ
রত্ননূপুর বাজে তায় ॥
পরিধান পীতাম্বব অধর বান্ধুলীবর[২]
মুখসুধাকরে সুধা হাস।
সঙ্গে লক্ষ্মী সবস্বতী নাভিপদ্মে প্রজাপতি
রূপে ত্রিভুবন পরকাশ ॥
ইন্দ্র আদি দেব সব চারি দিকে করে স্তব
সনকাদি যত ঋষিগণ।
নারদ বীণার তানে মোহিত যে গুণগানে
পঞ্চ মুখে গান পঞ্চানন ॥
কদম্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দ মনে
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়।
ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুমশর
নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায় ॥
ভৃঙ্গেব হুঙ্কার রব কুহরে কোকিল সব
পূর্ণ চন্দ্র শরদযামিনী।

১। মুরহর—মুরহা, মুর নামক দৈত্যকে যিনি হনন করিয়াছেন।

২। বাঁধুলী ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; বাঁধুলী একপ্রকার ফল। সাদা, কাল, পীত ও লাল—ঐ ফল এই চার বর্ণেরই হয়। লাল বাঁধুলীর সঙ্গে সুন্দরীদের অধরের তুলনা করা হয়।

বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে গান করে কামতন্ত্রে
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ॥
উর প্রভু শ্রীনিবাস নায়কের পূর আশ।
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
ভারত ও পদ আশে নূতন মঙ্গল* ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

কৌষিকীবন্দনা[১]

কৌষিকি কালিকে চণ্ডিকে অম্বিকে
প্রসীদ নগনন্দিনি।
চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি ॥
শঙ্করি সিংহবাহিনি।
মহিষমর্দ্দিনি দুর্গবিঘাতিনি
রক্তবীজনিকৃন্তিনি ॥[২]
দিনমুখরবি[৩] কোকনদ ছবি
অতুল পদ দুখানি।
রতননূপুর বাজায়ে মধুর
ভ্রমরঝঙ্কার মানি ॥
হেমকরিকর উরু মনোহর
রতন কদলিকায়।
কটি ক্ষীণতর নাভি সরোবর
অমূল্য অম্বর তায় ॥

---

* ভারতচন্দ্রের পূর্বে কেহ দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যবিষয়ক মঙ্গলকাব্য রচনা করেন নাই, তাই নূতন মঙ্গল।

১। বা কৌশিকী—আদ্যাশক্তি; দুর্গা নিশুম্ভবধের জন্য কালিকার কোষ বা কায়-সম্ভবা দেবী।

২। রক্তবীজ নামক অসুরকে কর্ত্তনকারী; নিকৃন্তিনী—ছেদক বা কর্ত্তনকারী।

৩। প্রভাতবেলার সূর্য।

লক্ষ্মীবন্দনা

কমল কোরক কদম্বনিন্দক
করিস্মৃতকুম্ভ উচ্চ।
কাঁচুলি রঞ্জিত অতি সুশোভিত
অমৃতপূরিত কুচ ॥
সুবলিত ভুজ সহিত অম্বুজ
কনক মৃণাল রাজে।
নানা আভরণ অতি সুশোভন
কনক কঙ্কণ বাজে ॥
কোটি শশধর বদন সুন্দর
ঈষদ মধুর হাস।
সিন্দূরমার্জ্জিত মুকুতারঞ্জিত
দশনপাঁতি প্রকাশ ॥
সিন্দূর চন্দন ভালে সুশোভন
রবি শশী এক ঠাঁই।
কেবা আছে সমা কি দিব উপমা
ত্রিভুবনে হেন নাই ॥
শিরে জটাজূট রতন মুকুট
অর্দ্ধ শশী ভালে শোভে।
মালতীমালায় বিজুলি খেলায়
ভ্রমর ভ্রময়ে লোভে ॥
কহি জোড়করে উরহ আসরে
ভারতে করহ দয়া।
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ে রাখ রাঙ্গা পায়ে
অভয় দেহ অভয়া ॥

লক্ষ্মীবন্দনা

উর লক্ষ্মি কর দয়া।
বিষ্ণুর ঘরণী ব্রহ্মার জননী
কমলা কমলালয়া ॥

সনাল[১] কমল সনাল উৎপল
দুখানি করে শোভিত।
কমল আসন কমল ভূষণ
কমলমাল ললিত॥
কমল চরণ কমল বদন
কমল নাভি গভীর।
কমল দু কর কমল অধর
কমলময় শরীর॥
কমলকোরক কদম্বনিন্দক
সুধার কলস কুচ।
করি অরি মাঝে জিনি করিরাজে
কুম্ভযুগচারু উচ॥
সুধাময় হাস সুধাময় ভাষ
দৃষ্টিতে সুধা প্রকাশ।
লাক্ষার কাঁচুলি চমকে বিজুলি
বসন লক্ষ্মীবিলাস॥
রূপ গুণ জ্ঞান যত যত স্থান
তুমি সকলের শোভা।
সদা ভুঞ্জে সুখ নাহি জানে দুখ
যে তব ভকতিলোভা।
সদা পায় দুখ নাহি জানে সুখ
তুমি হও যারে বাম।
সবে মন্দ কয় নাম নাহি লয়
লক্ষ্মীছাড়া তার নাম॥
তব নাম লয়ে লক্ষ্মীপতি হয়ে
ত্রিলোক পালেন হরি।

১। নাল বা ডাঁটা সহ।

যাদোগণেশ্বর[১] হৈলা রত্নাকর
তোমারে উদরে ধরি ॥
যে আছে সৃষ্টিতে নাম উচ্চারিতে
প্রথমে তোমার নাম ॥
তোমার কৃপায় অনায়াসে পায়
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম ॥
উব মহামায়া দেহ পদছায়া
ভারতেব স্তুতি লয়ে।
কৃষ্ণচন্দ্র বাসে থাক সদা হাসে
বাজলক্ষ্মী স্থিবা হয়ে ॥

সরস্বতীবন্দনা

উব দেবি সবস্বতি স্তবে কর অনুমতি
বাগীশ্বরি বাক্যবিনোদিনি।
শ্বেত বর্ণ শ্বেত বাস শ্বেত বীণা শ্বেত হাস
শ্বেতসরসিজনিবাসিনি ॥
বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র
নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ সেবা করে অনুক্ষণ
ঋষি মুনি কিন্নর কিন্নরী ॥
আগমের[২] নানা গ্রন্থ আর যত গুণপন্থ
চারি বেদ আঠার পুরাণ।
ব্যাস বাল্মীকাদি যত কবি সেবে অবিরত
তুমি দেবী প্রকৃতি প্রধান ॥
ছত্রিশ রাগিণী মেলে ছয় রাগ সদা খেলে
অনুরাগ যে সব রাগিণী।

১। যাদঃ—জলজন্তু, যাদোগণেশ্বর—জলজন্তুগণের অধিপতি অর্থাৎ সমুদ্র।
২। বেদ—যাহা স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে।

সপ্ত স্বর তিন গ্রাম মূর্চ্ছনা একুশ নাম
শ্রুতি কলা সতত সঙ্গিনী ॥
তান মান বাদ্য তাল নৃত্য গীত ক্রিয়া কাল
তোমা হৈতে সকল নির্ণয় ।
যে আছে ভুবন তিনে তোমার করুণা বিনে
কাহার শকতি কথা কয় ॥
তুমি নাহি চাহ যারে সবে মূঢ় বলে তারে
ধিক ধিক তাহার জীবন ।
তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে
গুণিগণে তাহার গণন ॥
দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল ।
আসরে আসিয়া উর নায়কের আশা পূর
দূর কর কুজ্ঞান সকল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি গীতে দিলা অনুমতি
করিলাম আরম্ভ সহসা ।
মনে বড় পাই ভয় না জানি কেমন হয়
ভারতের ভারতী ভরসা ॥

অন্নপূর্ণাবন্দনা

অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
কোটি কোটি করিএ প্রণাম ।
আসরে আসিয়া উর নায়কের আশা পূর
শুন আপনার গুণগ্রাম ॥
কৃপাবলোকন কর ভক্তের দুরিত হর
দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ ।
তুমি দেবী পরাৎপরা সুখদাত্রী দুঃখহরা
অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ ॥

রক্তসরসিজোপরি[১] বসি পদ্মাসন করি
পদতলে নবরবি দেখা।
রক্তজবাপ্রভাহর অতিমনোহরতর
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ[২] ঊর্দ্ধরেখা ॥
কিবা সুবলিত উরু কদলীকাণ্ডের গুরু
নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী।
শোভে নিরুপম বাস দশ দিশপরকাশ
ত্রিভুবনমোহনকারিণী ॥
কটি অতি ক্ষীণতর নাভি সুধাসরোবর
উচ্চ কুচ সুধার কলস।
কণ্ঠ কম্বুরাজ রাজে নানা অলঙ্কার সাজে
প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ ॥
কিবা মনোহর কর মৃণালের গর্ব্বহর
অঙ্গুলী চম্পকচারুদল।
ফণিরাজফণমণি কঙ্কণের কণকণি
নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥
বাম করতলে ধরি কারণ-অমৃত ভরি
পানপাত্র রতননির্ম্মিত।
রত্ন হাতা ডানি হাতে সঘৃত পলান্ন তাতে
কিবা দুই ভুজ সুললিত ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় নানা রস অপ্রমেয়
বিবিধ বিলাসে পরশিয়া।
ভুঞ্জাইয়া কৃত্তিবাস মধুর মধুর হাস
মহেশ্বর নাচন দেখিয়া ॥
দেবতা অসুর রক্ষ অপ্সর কিন্নর যক্ষ
সবে ভোগ করে নানা রস।

১। রক্তপদ্মের উপর। ২। ধ্বজ, বজ্র, ও অঙ্কুশ—বিষ্ণুর চরণচিহ্নত্রয়।

গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
নব গ্রহ দিক্‌পাল দশ ॥
জিনি কোটি শশধর কিবা মুখ মনোহর
মণিময় মুকুট মাথায়।
ললিত কবরীভার তাহে মালতীর হার
ভ্রমর ভ্রমরী কল গায় ॥
বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন আদি দেব ঋষিগণ
চৌদিকে বেড়িয়া করে গান।
আগম পুরাণ বেদ না জানে তোমার ভেদ
তুমি দেবী পুরুষ প্রধান।
ঘটে কর অধিষ্ঠান শুন নিজ-গুণগান
নায়কের পূর্ণ কর আশ।
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের আপদ্ হর
গায়কের কণ্ঠে কর বাস ॥
স্বপনে রজনীশেষে বসিয়া শিয়রদেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে ॥
বিস্তর অন্নদাকল্পে কত গুণ কব অল্পে
নিজ গুণে হবে বরদায়
নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় ॥

গ্রন্থসূচনা

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা ॥

অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বিকা অজয়া।
অপরাধ ক্ষমা অগো অব[১] গো অব্যয়া ॥
শুন শুন নিবেদন সভাজন সব।
যে রূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণা মহোৎসব ॥
সুজা খাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ।[২]
দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ ॥[২]
ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়।[২]
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায় ॥[২]
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব।[২]
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব ॥[২]
কটকে মুরসীদ্‌কুলি খাঁ নবাব ছিল।[২]
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল ॥[২]
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল ॥[২]
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে ॥[২]
লুঠি নিল নারী গারী[৩] দিল বেড়ি তোক[৪]।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক ॥
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর ॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া ॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধূম ॥

১। রক্ষা কর
২। ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য
৩। আগার ; ঘর ; সংসার , গৃহস্থালী   ৪। হাতকড়ি ; গলবদ্ধ শৃঙ্খল

ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল॥
মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।
করিব যবন সব সমূল নির্ম্মূল॥
নিষেধ করিল শিব ত্রিশূল মারিতে।
বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে॥
অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর।
না ছাড় সংহারশূল সংহর সংহর॥
আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।[১]
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনের করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত।[১]
বর্গি মহারাষ্ট্রি আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥[২]
পলাইয়া কোঠে[৩] গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥

১। ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য
২। ঝি-বউ
৩। দুর্গের মত সুরক্ষিত প্রাসাদ

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥
নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধশান্তমতি॥
প্রতাপতপনে কীর্ত্তিপদ্ম বিকাসিয়া
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া॥
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী ঋষি ঋষিরাজ।
ইন্দ্রের সমাজ সম যাঁহার সমাজ॥
কাশীতে বান্ধিলা জ্ঞানবাপীর[১] সোপান।
উপমা কোথায় দিব না দেখি সমান॥
দেবীপুত্র[২] বলি লোক যার গুণ গায়।
এহ পাপে সেহ রাজা ঠেকিলেন দায়॥
মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল[৩] হইল সুজন[৪] সর্ব্বভক্ষ॥
বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন॥
বদ্ধ করি রাখিলেক মুরশিদাবাদে।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে॥
দেবীপুত্র দয়াময় ধরাপতি ধীর।
বিবিধ প্রকারে পূজা করিলা দেবীর॥
চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া কৈলা স্তব।
অনুকম্পা স্বপনে হইল অনুভব॥

১। জ্ঞান-পাণী কুণ্ড, কাশীস্থ তীর্থ
২। প্রতি বৎসর মহাসমারোহে দুর্গোৎসব পালন করেন বলিয়া তিনি জনসাধারণে 'দেবীপুত্র' নামে খ্যাত।
৩। যে কর্মচারী প্রজার নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা আদায়ে তৎপর
৪। ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

অন্নপূর্ণা ভগবতী মুরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া ॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয় ॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস ॥
চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায় ॥
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায় ॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমাব গীত সাদরে কহিও ॥
আমি তাবে স্বপ্ন কব তাব মাতৃবেশে।
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে ॥
সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায় ॥
সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর।
অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতব ॥

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

নিবেদনে অবধান কর সভাজন।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ ॥
চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায় ॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে ॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্রহৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল ॥

দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত[১] সিত[২] হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময় ॥
প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সুজন।
পঞ্চ দেহে পঞ্চমুখ হৈলা পঞ্চানন ॥
প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায়।
দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায় ॥
তৃতীয় যে হরচন্দ্র হর অবতার।
চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশ আকার ॥
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই।
ফুলের মুখটী জয়গোপাল জামাই ॥
দ্বিতীয় পক্ষের যুবরাজ রাজকায়।
মধ্যম কুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্র রায় ॥
জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম।
সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম ॥
শ্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটী।
আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পালটী ॥
রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম।
মুখটী অনন্তরাম চট্ট বলরাম ॥
বলরাম চট্টসুত ভাগিনা রাজার।
সদাশিব রায় নাম শিব অবতার ॥
দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখয্যের সুত।
রায় চন্দ্রশেখর অশেষ গুণযুত ॥
ভূপতির ভাগিনীজামাই গুণধাম।
বাঁড়ুরি গোকুল কৃপারাম দয়ারাম ॥
মুর্খ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার।
পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্ক অলঙ্কার ॥

১। কৃষ্ণবর্ণ ২। শুক্লবর্ণ

ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি ।
তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি ॥
ভূপতির পিসার জামাই তিন জন ।
কৃষ্ণানন্দ মুখয্যা পরম যশোধন ॥
মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর ।
মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলাধর ॥
প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায় ।
শুকদেব রায় ঋষি শুকদেব প্রায় ॥
কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ ।
কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ ॥
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড় ।
মুক্তিরাম মুখয্যা গোবিন্দভক্ত দড় ॥
গণক বাঁড়ুয্যা অনুকূল বাচস্পতি ।
আর যত গণক গণিতে কি শকতি ॥
বৈদ্যমধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায় ।
জগন্নাথে অনুজ নিবাস সুগন্ধায় ॥
অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ ।
হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ ॥
চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহবতি[১] ।
রায় বক্সী মদনগোপাল মহামতি ॥
কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুনশী প্রধান ।
তার ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান ॥
কালোয়াত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি
মৃদঙ্গী সমজ খেল কিন্নর আকৃতি ॥
নর্ত্তকপ্রধান শেরমামুদ সভায় ।
মোহন খোষালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায় ॥

১। সহবাস।

ঘড়ীয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কত জন।
চেলা খানেজাদ[১] যত কে করে গণন॥
সেফাহীব[২] জমাদার মামুদ জাফব।
জগন্নাথ শিরপা[৩] করিলা যাব পব॥
ভূপতিব তীরের ওস্তাদ নিরুপম।
মুজঃফব হুসেন মোগল কর্ণসম॥
হাজারি পঞ্চম সিংহ ইন্দ্রসেনসুত।
ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত॥
যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আব যত।
ভোজপুবে সোযার বোঁদেলা[৪] শত শত॥
কল্লমালে[৫] বঘুনন্দন মিত্র দেয়ান।
তাব ভাই বামচন্দ্র বাঘব ধীমান॥
আমীন বাঢ়ীয দ্বিজ নীলকণ্ঠ বায়।
দুই পুত্র তাহাব তাহাব তুল্য কায়॥
বড বামলোচন অশেষ গুণধাম।
ছোট বামকৃষ্ণ বায় অভিনব কাম॥
দেয়ানের পেশকাব বক্সু বিশ্বনাথ।
আমীনেব পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ॥
বত্নগজ আদি দিগ্‌গজ সংখ্যায়।
উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায়॥
হাবসী ইমামবক্স হাবসী প্রধান।
হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান॥
অধিকার রাজাব চৌরাশী পরগণা।
খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥

১। ক্রীতদাসের সন্তান ২। সিপাহী; সৈন্য। ৩। শিরোপা-পারিতোষিক।
৪। বুন্দেলখণ্ড হইতে আগত সৈন্য। ৫। সমস্ত রাজস্বের।

দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গাঙ্গ পার ॥
ফরমানী মহারাজ মনসবদার।[১]
সাহেব নহবৎ[ক] আর কানগোই[২] ভার ॥
কোঠায় কাঙ্গুরা[৩] ঘড়ী নিশান নহবৎ।
পাতশাহী শিরপা সুল্‌তানী সুলতানৎ[৪] ॥
ছত্র দণ্ড আড়ানী[৫] চামর মোরছল[৬]।
সরপেচ[৭] মোরছা কলগী[৮] নিরমল ॥
দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে।
ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে ॥
সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্তমহিমা ॥
কবি রায় গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া ॥
অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে।
স্বপন কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে ॥
অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী ॥
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে ॥

১। বাদশাহের ফরমান বা পরোয়ানার বলে যিনি মনসবদার বা রাজপুরুষ নিযুক্ত হইয়াছেন অর্থাৎ বাংলার নবাবের সৃষ্ট জমিদার তিনি নহেন।

(ক) বাদশাহ যাহাকে নিজের বাড়ীতে সানাই বাজাইবার অধিকার দিয়াছেন।

২। কানুনগো ; যাহারা জমি জরীপ ইত্যাদির কাজে নিযুক্ত হয়।

৩। সরু উচ্চ চূড়া। ৪। রাজত্ব ৫। চন্দ্রাতপ ; চাঁদোয়া

৬। ময়ূরের পালক দিয়া তৈয়ারী পাখা।

৭। পাগড়ির উপর জড়াইবার জন্য মূল্যবান বস্ত্র।

৮। পাগড়ির সামনে বাঁধা উট বা বক পক্ষীর পালক।

ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত।
কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত ॥
অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়।
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয় ॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে।
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে ॥
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা ॥

গীতারম্ভ

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার মায়া
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্য নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি ॥
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি ॥
বিনা চন্দ্রানলরবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা ॥
গুণত্রয় সত্ত্বতমোরজে হরিহরকমলজে
কহিলেন তপ তপ তপ।
শুন বিধি হরি হর তিন জনে পরস্পর
করেন কারণ জলে জপ ॥
তিনের জানিতে সত্ত্ব জানাইতে নিজ তত্ত্ব
শবরূপা হইলা কপটে।

পচাগন্ধ মাংস গলে ভাসিয়া কারণ জলে
আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে ॥
পচা গন্ধে ব্যস্ত হরি উঠি গেলা ঘৃণা করি
বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা ।
পচা গন্ধে ভাবি দুখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ
চারি মুখ হইলা বিধাতা ॥
বিধির বুঝিয়া সত্ত্ব শিবের জানিতে তত্ত্ব
শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া ।
শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই বসিতে হইল ঠাঁই
যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া ॥
দেখিয়া শিবের কর্ম্ম তাহাতে বসিল মর্ম্ম
ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা ।
পতিরূপ পশুপতি দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা ॥
বিধির মানস সুত দক্ষ মুনি তপযুত
প্রসূতি তাহার ধর্ম্মজায়া ।
তার গর্ভে সতী নাম অশেষ মঙ্গল ধাম
জনম লভিলা মহামায়া ॥
নারদ ঘটক হয়ে নানামত বলে কয়ে
শিবেরে বিবাহ দিলা সতী ।
শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈলা বামমতি ॥
সদাশিব নিন্দা করে মহা ক্রোধ হৈল হরে
সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে ।
দক্ষেরে বিধাতা বাম না লয় শিবের নাম
সদা নিন্দা করে কটু ভাষে ॥
আরম্ভিয়া দেবযাগ নিমন্ত্রিল দেবভাগ
নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে ।
যাইতে দক্ষের বাস সতীর হইল আশ
ভারত কহিছে জোড় করে ॥

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ

কালীরূপে কত শত পরাৎপরা গো।
অন্নদা ভুবনা বলা মাতঙ্গী কমলা
দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরবরা গো॥
সুন্দরী ভৈরবী তারা জগতের সারা
উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা গো।
রাধানাথের দুঃখভরা নাশ গো সত্বরা
কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো॥

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥

কালীরূপা

মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা[1]।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপুরা[2]॥
গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে॥
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বর দান॥

১। বৃহৎ দন্তবিশিষ্টা ২। কালীর কর্ণের ভূষণ শিশুশব,

লোল জিহ্বা রক্তধারা মুখের দু পাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে॥

তারারূপা

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ একজটা বিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদব পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥

রাজরাজেশ্বরী

দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী।
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ।
পঞ্চপ্রেতনিরমিত বসিবার মঞ্চ॥

ভুবনেশ্বরী

দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা।
হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা॥
রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল॥

ভৈরবীরূপা

দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে॥
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণভূষণা॥
অক্ষমালা[1] পুথী[2] বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অৰ্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর॥

ছিন্নমস্তা

দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত।
ছিন্নমস্তা হইলা সতী অতি বিপরীত॥
বিকসিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাজে।
তিন গুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে॥
বিপরীত রতে রত রতি কামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার।
এক ধারা নিজ মুখে করেন আহার॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিণী॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অৰ্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন॥

ধূমাবতী

দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন।

১। রুদ্রাক্ষমালা ২। পুথি

অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজরথারূঢ়া[১] ধূমের বরণ॥
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা॥

বগলামুখী

ধূমাবতী দেখি ভীম সভয় হইলা।
হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা॥
রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা॥
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া ঊর্দ্ধ করি॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন॥

মাতঙ্গী

দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া।
পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া॥
রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে।
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে॥

মহালক্ষ্মী

মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান।
মহালক্ষ্মীরূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান॥
সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥

[১] যাঁহার ধ্বজায় কাকচিহ্ন অঙ্কিত আছে; সেইরূপ ধ্বজবিশিষ্ট রথে যিনি আরূঢ়া।

চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥
ভারত কহিছে মা গো এই দশ রূপে।
দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে॥

সতীর দক্ষালয়গমন

এ কি মায়া এ কি মায়া কব মহামায়া।
সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া॥
নিগম আগমে তুমি নিরুপমকায়া।
ত্রিগুণজননী পুন ত্রিদেবের জায়া॥
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে সহায়া।
ভারত কহিছে মোরে দেহ পদছায়া॥
পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর হৈলা হর।
কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর॥
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়।
কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয়॥
কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে।
পূর্ব্ব সর্ব্ব জান কেন পাসরিলা এবে॥
পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে।
প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে॥
তিন জনে তোমরা কারণ-জলে ছিলা।
তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা॥
তিন জন পরস্পর লাগিলা জপিতে।
শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে॥
পচা গন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভ.াি দুখ।
বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ॥
তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন।
প্রকৃতিরূপেতে তোমা করিনু ভজন॥

পুরুষ হইলা তুমি আমার ভজনে।
সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে ॥
এত শুনি শিবের হইল চমৎকার।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাকার ॥
লুকাইয়া দশ মূর্ত্তি সতী হইলা সতী।
গৌর বর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীয় মূরতি ॥
মোহিত মহেশ মহামায়াব মায়ায়।
যে ইচ্ছা কবহ বলি দিলেন বিদায় ॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীবে।
রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষেব মন্দিরে ॥
প্রসূতি সতীরে দেখি কালীয়বরণ।
কহিল দেখিয়াছিল যেমন স্বপন ॥
আহা মরি বাছা সতি কালী হইয়াছ।
ছাড়িবে আমাবে বুঝি মনে করিয়াছ ॥
স্বপনে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে।
শিবনিন্দা শুনে তুমি শরীর ছাড়িবে ॥
শিব করিবেন দক্ষে যজ্ঞ সহ নাশ।
তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিশ্বাস ॥
জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়।
জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায় ॥
মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া।
যজ্ঞ দেখিবারে গেল সত্বরা হইয়া ॥
কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে।
শিবনিন্দা করিয়া সভার আগে বলে ॥
ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে।
নিন্দাছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে ॥

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান সুস্থান কুস্থান
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম নাহি মানে কর্ম্ম
চন্দনে ভস্মজ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে কুক্কুরে আপনে
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল তবু না মরিল
ভাঙ্গড়ের[১] নাহি যম॥
সুখে দুঃখ জানে দুঃখে সুখ মানে
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে
সদা কদাচারময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ
বেদচারবহিস্কৃত।
ক্ষত্রিয়কথন না হয় ঘটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয় চাষী কেন নয়
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা
নাগের পৈতা গলায়॥
গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়
না করে অতিথিসেবা।

১। সিদ্ধিখোর

সতী ঝি আমাব গৃহিণী তাহার
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা ॥
বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিতে
কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনীবিহারী নহে ব্রহ্মচারী
এ কি মহাপাপ হব ॥
সতী ঝি আমাব বিদ্যুত আকাব
বাতুলেব হৈল জায়া।
আমি অভাজন পবম ভাজন
ঘটক নাবদ ভাযা ॥
আহা মবি সতি কি দেখি দুর্গতি
অন্ন বিনা হৈলা কালি।
তোমাব কপাল পব বাঘছাল
আমাব বহিল গালি ॥
শিবনিন্দা শুনি বোষে যত মুনি
দধীচি অগস্ত্য আদি।
দক্ষে গালি দিয়া চলিলা উঠিয়া
শ্রবণে কব আচ্ছাদি ॥
তবু পাপ দক্ষ নিন্দি কত লক্ষ
সতী সম্বোধিয়া কহে।
তার মৃত্যু নাই তোর নাহি ঠাঁই
আমাব মরণ নহে ॥
মোর কন্যা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে
ছি ছি এ কি দশা তোর।
আমি মহারাজ তোর এই সাজ
মাথা খেতে আলি মোর ॥
বিধবা যখন হইবি তখন
অন্ন বস্ত্র তোরে দিব।

সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে
তার মুখ না দেখিব ॥
শিবনিন্দা শুনি মহাদুঃখ গুণি
কহিতে লাগিলা সতী।
শিবনিন্দা কর কি শকতি ধর
কেন বাপা হেন মতি ॥
যারে কালে ধরে সেই নিন্দে হরে
কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গজনু তেজিব এ তনু
তবে যাবে মোর পাপ ॥
তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয়
মোর যেতে আছে ঠাঁই।
কর্ম্ম মত ফল যজ্ঞ যাবে তল
তোর রক্ষা আর নাই ॥
যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল ॥
হিমগিরিপতি ভাগ্যবান অতি
মেনকা তাহার জায়া।
পূর্ব্বতপবরে তাহার উদরে
জনমিলা মহামায়া ॥
সতী দেহ ত্যাগে নন্দী মহা রাগে
সত্বরে গেল কৈলাসে।
শূন্য রথ লয়ে শোকাকুল হয়ে
নিবেদিলা কৃত্তিবাসে ॥
শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর
বিস্তর কৈলা রোদন।

লয়ে নিজগণ করিলা গমন
করিতে দক্ষদমন ॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষগুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর ॥

শিবের দক্ষালয় যাত্রা

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা ॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে ॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটীকট্টসদ্যোমরা[1] হস্তিছালা ॥
পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে ॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কারে হাঁকে উড়ে সর্পবাণা ॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥

১। কটীকট—কটিদেশের মধ্যস্থল বা ক্ষীণভাগ

চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্তকেশে॥
গিয়া দক্ষ যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে[১] কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

দক্ষযজ্ঞনাশ*

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ[২] সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥
সৈন্যসূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি॥
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।
যাও যাও হুঁ[৩] দিখাও দক্ষ দেই হাঁকিয়া॥
সে সভায় আত্মগায়[৪] রুদ্র দেন নির্বৃতি[৫]।
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি॥
রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গিয়া[৬]।
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া॥
ভর্গাবের[৭] সৌষ্ঠবের[৮] দাড়ি গোঁপ ছিণ্ডিল।
পূষণের[৯] ভূষণের[১০] দন্তপাঁতি পাড়িল॥

১। এই ছন্দে প্রতি চরণে ১২টি অক্ষর থাকে। লঘু+গুরু+গুরু—এই ক্রমে তিনটি করিয়া অক্ষর চারবার পুনরাবর্তিত হয়। ইহা সংস্কৃত ছন্দ।

* তূণক ছন্দের আকর্ষণই এখানে প্রবল। ছন্দের অনুরোধে কবি কিছু কিছু এমন সব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা অর্থহীন বলিয়া মনে হয়।

২। প্রেতগণ। ৩। হুঙ্কার শব্দে তাড়না। ৪। নিজের অনুচরবৃন্দকে। ৫। মুক্তি, অভয়। ৬। সঙ্গী। ৭। দক্ষের পুরোহিত। ৮। সৌন্দর্যযুক্ত। ৯। সূর্যের। ১০। সুন্দর।

বিপ্র সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে
ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কীল মারিছে ॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে ॥
যক্ষ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে।
ঊর্দ্ধহাথ বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে ॥
মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে ॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম খুম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে ॥
ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্প ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে ॥
অগ্নি জ্বালি সর্পি[১] ঢালি দক্ষ দেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে ॥
হাস্যতুণ্ড[২] যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মুতিছে।
পাদ ঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পুঁতিছে ॥
রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
স্থূল থূল কূল কূল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে ॥
মৌন তুণ্ড হেঁট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে ॥
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের[৩] ছন্দ বন্ধ বাড়িছে ॥

১। ঘৃত। ২। হাসিমুখ।

৩। ইহাতে প্রত্যেক চরণে ১৫টি অক্ষর থাকে। এই ছন্দে অক্ষরগুলি 'গুরু+লঘু+গুরু' এবং 'লঘু+গুরু+লঘু'—এই ক্রমে দুইবার আবর্ত্তিত হয় এবং শেষে 'গুরু+লঘু+গুরু' অক্ষরের সমাবেশ থাকে। অক্ষরগুলি সাজাইলে গুরু+লঘু—ক্রমে ইহারা সাতবার পুনরাবর্ত্তিত হয় এবং শেষের অক্ষরটি গুরু হয়। ইহাতে প্রতি চরণে মাত্রাসংখ্যা থাকে ২৩। প্রতি যুগ্ম অক্ষরের পর বিরাম লওয়া যায় বলিয়া ছন্দটি শ্রুতিমধুর। ইহা সংস্কৃত ছন্দ।

প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন

শিবনাম বল রে জীব বদনে।
যদি আনন্দে যাবে শিবসদনে ॥
শিবনাম লয়ে মুখে তরিব সকল দুখে
দমন করিব সুখে শমনে।
শিবগুণ কি কহিব কোথায় তুলনা দিব
জীব শিব হয় শিব সেবনে ॥
শিব শিব বলে যেই এই দেহে শিব সেই
শিব নিজপদ দেই সে জনে।
কাতরে করুণা কর পাপ তাপ সব হর
ভারতে রাখহ হর ভজনে ॥

এইরূপে যজ্ঞ সহ দক্ষ নাশ পায়।
প্রসূতি বাঁচিলা মাত্র সতীর কৃপায় ॥
বিধি বিষ্ণু দুই জন নিজ স্থানে ছিলা।
দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইলা ॥
অকালে প্রলয় জানি করেন শঙ্কর।
দক্ষবাসে শিব পাশে আইলা সত্বর ॥
সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া।
প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া ॥
গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ।
শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেঁটমুখ ॥
দূর গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয়।
প্রসূতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয় ॥
বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী।
অসীম মহিমা জানে কাহার শকতি ॥
আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
সতী মোর কন্যা তুমি আমার জামাই ॥

বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ় ॥
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ।
দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ ॥
যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল।
যে করিলে সেহ নহে তাব মত ফল ॥
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি।
ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী ॥
সতীব জননী আমি শাশুড়ী তোমার।
তথাপি বিধবা দশা হইল আমাব ॥
ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি।
তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি ॥
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়।
আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময় ॥
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা।
রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা ॥
ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায় ॥
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায় ॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ।
প্রসূতি বলিছে প্রভু এ কি বিড়ম্বন ॥
বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা।
কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা ॥
শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব।
ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব[১] ॥
অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ।
কৃপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান ॥

১। নরক বিশেষ অর্থাৎ শাস্তিভোগ করা।

শুনিয়া নন্দীরে শিব কহিলা হাসিয়া।
কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া॥
নন্দী বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ।
ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ॥
শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়।
যেমন করিল কর্ম্ম উপযুক্ত হয়॥
শিববাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া।
মুণ্ড আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেক আঁটিয়া॥
মিলন হইল ভাল হর দিলা বর।
শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর॥
তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর।
তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও।
পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও॥
নিরাকার নির্গুণ নিঃসীম নিরুপম।
না জানি করিনু নিন্দা অপরাধ ক্ষম॥
বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল।
নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল॥
বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া।
যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া॥
যজ্ঞস্থানে সতীদেহ দেখিয়া শঙ্কর।
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর॥
শিরে লয়ে সতীদেহ করিলা গমন।
গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ॥
বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিলা গদাধর।
সতীদেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর॥
তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি।
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি॥

যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর।
মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির॥
করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব।
বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব॥
একমত না হয় পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রমত॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

পীঠমালা

ভবসংসার ভিতরে। ভব ভবানী বিহরে॥
ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ
নরনারীকলেবরে।
গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লয়ে
দোঁহে নানা খেলা করে॥
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম
সব জীবের অন্তরে।
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে
দেহিদেহরূপে চরে॥
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া
এ কি করে চরাচরে।
পাইয়াছে টের কি করে এ ফের
কবি রায় গুণাকরে॥

হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধ্র ফেলিলা কেশব।
দেবতা কোট্টবী ভীমলোচন ভৈরব॥১
শর্করারে তিন চক্ষু ত্রিগুণ ভৈরব [বৈভব ?]।
মহিষমর্দ্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব॥২

সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা।
ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা ॥৩
জ্বালামুখে জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব।
দেবীর অম্বিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব ॥৪
ভৈরব পর্ব্বতে ওষ্ঠ পড়ে চক্রঘায় ॥
নম্রকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তায় ॥৫
প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে।
বক্রতুণ্ড ভৈরব প্রত্যক্ষরূপ যাহে ॥৬
জনস্থানে চিবুক পড়িল অভিরাম।
বিকৃতাক্ষ ভৈরব ভ্রামরী দেবী নাম ॥৭
গোদাবরীতীরে পড়ে বাম গণ্ডখানি।
বিশ্বেশ ভৈরব বিশ্বমাতৃকা ভবানী ॥৮
গণ্ডকীতে ডানি গণ্ড পড়ে চক্রঘায়।
চক্রপাণি ভৈরব গণ্ডকী চণ্ডী তায় ॥৯
ঊর্দ্ধ দন্তপাঁতির অনলে হৈল ধাম।
সংক্রূব ভৈরব দেবী নারায়ণী নাম ॥১০
পঞ্চসাগরেতে পড়ে অধোদন্তসার।
মহারুদ্র ভৈরব বারাহী দেবী তার ॥১১
করতোয়াতটে পড়ে বাম কর্ণ তাঁর।
বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার ॥১২
শ্রীপর্ব্বতে ডানি কর্ণ ফেলিলেন হরি।
ভৈরব সুন্দরানন্দ দেবতা সুন্দরী ॥১৩
কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ।
উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ ॥১৪
কিরীটকোণায় পড়ে কিরীট স্বরূপ।
ভুবনেশী দেবতা ভৈরব সিদ্ধরূপ ॥১৫
শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি ॥১৬

কাশ্মীরেতে কণ্ঠ দেবী মহামায়া তায়।
ত্রিসন্ধ্য ঈশ্বর নাম ভৈরব তথায় ॥১৭
রত্নাবলী স্থানে ডানি স্কন্ধ অভিরাম।
কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম ॥১৮
মিথিলায় বাম স্কন্ধ দেবী মহাদেবী।
মহোদর ভৈরব সর্ব্বার্থ যাঁরে সেবি ॥১৯
চট্টগ্রামে ডানি হস্ত অর্দ্ধ অনুভব।
ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব ॥২০
আর অর্দ্ধ ডানি হস্ত মানসরোবরে।
দেবী দাক্ষায়ণী হর ভৈরব বিহরে ॥২১
উজ্জানীতে কফোণি[1] মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যারে সেবি ॥২২
মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার।
স্থাণু নামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর ॥২৩
প্রয়াগেতে দু হাতের অঙ্গুলী সরস।
তাহাতে ভৈরব দশ মহাবিদ্যা দশ ॥২৪ ইং ৩৩
বাহুলায় বাম বাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব ॥৩৪
মণিবন্ধে বাম মণিবন্ধ অভিরাম।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব গায়ত্রী দেবী নাম ॥৩৫
জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তন।
ত্রিপুরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ ॥৩৬
আর স্তন পড়ে তাঁর রামগিরি স্থানে।
শিবানী দেবতা চণ্ড ভৈরব সেখানে ॥৩৭
বৈদ্যনাথে হৃদয় ভৈরব বৈদ্যনাথ।
দেবী তাহে জয়দুর্গা সর্ব্ব সিদ্ধি সাথ ॥৩৮

১। কনুই।

উৎকলে পড়িল নাভি মোক্ষ যাহা সেবি।
জয় নামে ভৈরব বিজয়া নামে দেবী ॥ ৩৯
কাঞ্চী দেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম।
বেদগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম ॥ ৪০
নিতম্বের অর্দ্ধ কালমাধবে তাঁহার।
অসিতাঙ্গ ভৈরব দেবতা কালী তাঁর। ৪১
নিতম্বের আর অর্দ্ধ পড়ে নর্ম্মদায়।
ভদ্রসেন ভৈরব শোণাক্ষী দেবী তায় ॥ ৪২
মহামুদ্রা কামরূপে রজোযোগ যায়।
রাবানন্দ ভৈরব কামাখ্যা দেবী তায় ॥ ৪৩
নেপালে দক্ষিণ জঙ্ঘা কপালী ভৈরব।
দেবী তায় মহামায়া সদা মহোৎসব ॥ ৪৪
জয়ন্তায় বাম জঙ্ঘা ফেলিলা কেশব।
জয়ন্তী দেবতা ক্রমদীশ্বর ভৈরব ॥ ৪৫
দক্ষিণ চরণখানি পড়ে ত্রিপুরায়।
নল নামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তায় ॥ ৪৬
ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব।
যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব ॥ ৪৭
কালীঘাটে চারিটি অঙ্গুলি ডানি পার।
নকুলেশ ভৈরব কালিকা দেবী তার ॥ ৪৮
কুরুক্ষেত্রে ডানি পার গুল্‌ফ অনুভব।
বিমলা তাহাতে দেবী সম্বর্ত্ত ভৈরব ॥ ৪৯
বিভাসেতে বাম গুল্‌ফ ফেলিলা কেশব।
ভীমরূপা দেবী তাহে কপালী ভৈরব ॥ ৫০
তিরোতায় পড়ে বাম পদ মনোহর।
অমরী দেবতা তাহে ভৈরব অমর ॥ ৫১
শূন্য শির দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান।
হিমালয় পর্ব্বতে বসিলা করি ধ্যান ॥

কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

শিববিবাহের মন্ত্রণা

উমা দয়া কর গো। বিষম শমনভয় হর গো॥
পাপেতে জড়িত মতি কাতর হয়েছি অতি
পতিতপাবনী নাম ধর গো।
মা বলিয়া ডাকি ঘন শুনিয়া না দেহ মন
গুহ গজাননে বুঝি ডর গো
তুমি গো তারিণী তারা অসার সংসার সারা
নানারূপে চরাচরে চর গো।
রাধানাথ তব দাস পূরাও তাহার আশ
তবে ঋণিচক্র ঋণে তর গো॥

উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর।
মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর॥
ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব
শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব॥
নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব।
মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব॥
হইল আকাশবাণী সকলে শুনিলা।
মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা॥
উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার।[১]
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার॥
তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ।
তবে সে শর্ব্বের হবে সংসার নির্ব্বাহ॥

১। শিবপুরাণ অনুসারে মাতা মেনকাকর্তৃক 'উ (ও) মা (না)' এইরূপে তপশ্চর্যা হইতে নিবারিত হওয়ায় জন্যই পার্ব্বতীর নাম হয় উমা।

আকাশবাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ।
নারদেরে ডাকিয়া কহিলা হৃষীকেশ ॥
ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও।
উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও ॥
একে তো নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ।
শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ ॥
জনকের জননীর দেখিব চরণ।
আর কবে হব হেন ভাগ্যের ভাজন ॥
মাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান।
ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান ॥

নারদের গান

জয় দেবি জগন্ময়ি দীনদয়াময়ি
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে ॥
জয় কালি কপালিনি মস্তকমালিনি
খর্পরধারিণি শূলধরে।
জয় চণ্ডি দিগম্বরি ঈশ্বরি শঙ্করি
কৌষিকি ভারতভীতিহরে।

শিববিবাহের সম্বন্ধ

এরূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া।
উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া ॥
দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে।
চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশ সঙ্গে ॥
মৃত্তিকার হর গৌরী পুত্তলি গড়িয়া ॥
সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া ॥

দেখি নারদের মনে হৈল চমৎর্কার।
এ কি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার॥
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম।
আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরিনাম॥
অভীষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে।
নারদে কহিলা দেবী গর্ব্বিত ভর্ৎসনে॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়।
আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয়॥
অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে।
দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥
মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে।
তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে॥
আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি।
ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী॥
নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে।
পাকা দাড়ি-বুড়া বর ঘটাব তোমারে॥
আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাঁত
ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাত॥
বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে॥
আল্যা[১] করি কোলে বসি ছেঁদে[২] ধরি গলে।
ও মা ও মা বলি উমা কথা কন ছলে॥
সখী মেলি খেলিনু বাহিরবাড়ি গিয়া।
ধূলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥
কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা[৩] বামন।
প্রণাম করিল মোরে এ কি অলক্ষণ॥

১। আদর ; সোহাগ ২। জড়াইয়া ৩। ডেকরা ; গালাগালি বিশেষ

নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥
ছুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ একখান।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান॥
ভাবে বুঝি সে বামন বড় কন্দলিয়া।
দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া॥
শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ।
সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ॥
হিমালয় শুনিয়া আইলা দ্রুত হয়ে।
সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে॥
নারদ কহেন শুন শুন হিমালয়।
কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয়॥
এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে।
অখিলভুবনমাতা জানিতে কে পারে॥
বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ কিবা।
শিব পতি ইঁহার ইঁহার নাম শিবা॥
হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে।
ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে॥
নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি।
জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি॥
হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়।
লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম

শিবের সম্বন্ধ করিয়া নির্ব্বন্ধ
আইলা নারদ মুনি।
কমললোচন আদি দেবগণ
পরম আনন্দ শুনি॥
সকলে মিলিয়া শিব কাছে গিয়া
বিস্তর করিলা স্তব।
নাহি ভাঙ্গে ধ্যান দেখি চিন্তাবান
হইলা বিধি কেশব॥
মন্ত্রণা করিয়া মদনে ডাকিয়া
সুরপতি দিলা পান।
সম্মোহন বাণ করিয়া সন্ধান
শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রতিপতি ধায়
পুষ্পশরাসন হাতে।
সমুখে সামন্ত ধাইল বসন্ত
কোকিল ভ্রমর সাতে॥
মলয় পবন বহে ঘন ঘন
শীতল সুগন্ধ মন্দ।
তরু লতাগণ ফুলে সুশোভন
জগতে লাগিল ধন্দ॥
যত দেবগণ হৈল অদর্শন
হরের ক্রোধের ভয়।
পূর্ব্ব নিয়োজন নিকট মরণ
মদন সমুখে রয়।
আকর্ণ পূরিয়া সন্ধান করিয়া
সম্মোহন বাণ লয়ে।

ভূমে হাঁটু পাড়ি দিল বাণ ছাড়ি
অনলে পতঙ্গ হয়ে ॥
কিবা করে ধ্যান কিবা করে জ্ঞান
যে করে কামের শর।
সিহরিল অঙ্গ ধ্যান হৈল ভঙ্গ
নয়ন মিলিলা হর ॥
কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি ব্যস্ত
নেহালেন চারি পাশে।
সমুখে মদন হাতে শরাসন
মুচকি মুচকি হাসে ॥
দেখি পুষ্পশরে ক্রোধ হৈল হরে
অটল অচল টলে।
ললাটলোচন হৈতে হুতাশন
ধক ধক ধক জ্বলে ॥
মদন পলায় পিছে অগ্নি ধায়
ত্রিভুবন পরকাশি।
চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পুড়িয়া
করিল ভস্মের রাশি॥
মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া[১]
ফিরেন সকল স্থানে ॥
কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর
কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল ॥

১। খুঁজিয়া।

মনে মনে হাসি হেন কালে আসি
নারদ হইলা সমুখ।
নারদে দেখিয়া সলজ্জ হইয়া
ধর হৈলা হেঁটমুখ॥
খুড়া খুড়া কয়ে দণ্ডবত হয়ে
কহিছে নারদ আসি॥
দক্ষগৃহ ছাড়ি হেমন্তের বাড়ি
জনমিলা সতী আসি॥
বিবাহ করিয়া তাঁহারে লইয়া
আনন্দে কর বিহার।
শুনি শিব কন ওরে বাছাধন
ঘটক হও তাহার॥
মুনি কহে দ্রুত সকলি প্রস্তুত
বর হয়ে কবে যাবা।
কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা॥
শুনি মুনি কয় এমন কি হয়
সর্ব্ব দেবগণে কহ॥
প্রায় হয়ে বুড়া ভুলিয়াছ খুড়া
দিন দুই স্থির রহ॥
শান্ত হৈলা হর যতেক অমর
এল যথা পশুপতি।
কামের মরণ করিয়া শ্রবণ
কান্দিয়া আইলা রতি॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর॥

রতিবিলাপ

পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে রুধির বহিছে ধারে
কাম-অঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে ॥
আলু থালু কেশবাস ঘন ঘন বহে শ্বাস
সংসার পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ আমাবে করহ সাথ
তোমা বিনা সকলি আঁধার ॥
তুমি কাম আমি রতি আমি নাবী তুমি পতি
দুই অঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল শেষে তাহা না রহিল
পিরীতির এ নহে বিধান ॥
যথা যথা যেতে প্রভু মোরে না ছাড়িতে কভু
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছা প্রেম বাড়াইয়া ভাল গেলা ছাড়াইয়া
এখন বুঝিনু মিছা খেলা ॥
না দেখিব সে বদন না হেরিব সে [illegible]
না শুনিব সে মধুর বাণী।
আগে মরিবেন স্বামী পশ্চাতে মরিব আমি
এত দিন ইহা নাহি জানি ॥
আহা আহা হরি হরি উহু উহু মরি মরি
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।
হৃদয়েতে দিতে স্থান করিতে কতেক মান
এখন দেখিতে আর নাই ॥
শিব শিব শিব নাম সবে বলে শিবধাম
বাম দেব আমার কপালে।

যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে তার দৃষ্টে প্রভু মরে
এমন না দেখি কোন কালে ॥
শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন ॥
অনলে শরীর ঢালি তথাপি রহিল গালি
মদন মরিলে মৈল রতি।
এ দুঃখে হইতে পার উপায় না দেখি আর
মরিলেহ নাহি অব্যাহতি ॥
অরে নিদারুণ প্রাণ কোন্ পথে পতি যান
আগে যা রে পথ দেখাইয়া।
চরণ রাজীবরাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া ॥)
অরে রে মলয় বাত তোরে হৌক বজ্রাঘাত
মরে যা রে ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অল্পায়ু হও বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও
প্রভু বধি সবে পলাইলা ॥
কোথা গেলা সুররাজ মোর মুণ্ডে হানি বাজ
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি আমি তাহে দেহ ঢালি
অন্তকালে কর এই ধর্ম্ম ॥
বিরহ সন্তাপ যত অনলে কি তাপ তত
কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয় কাঁদিলে কি আর হয়
এই ফল বিরহীর শাপে ॥

রতির প্রতি দৈববাণী

অগ্নিকুণ্ড জ্বালি রতি সতী হৈতে চায়।
হইল আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
শুন রতি তনু ত্যাগ না কর এখন।
শুনহ উপায় কহি পাইবে মদন॥
দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার।
কংস বধি করিবেন দ্বারকা বিহার॥
রুক্মিণীরে লইবেন বিবাহ করিয়া।
তাঁর গর্ভে এই কাম জনমিবে গিয়া॥
শম্বর দানব বড় হইবে দুর্জ্জন।
মদনের হাতে তার মৃত্যু নিয়োজন॥
দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে।
লুকাইয়া এইরূপ মায়াবতী নামে॥
কহিবেন শম্বরে নারদ তপোধন।
জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন॥
শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয়।
মায়া করি দ্বারকায় যাবে দুরাশয়॥
মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে।
হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে॥
মৎস্যে গিলিবেক তারে আহার বলিয়া।
না মরিবে কাম ভবিতব্যের লাগিয়া॥
সেই মৎস্য জালিয়া ধরিয়া লবে জালে।
ভেট লয়ে দিবেক শম্বর মহীপালে॥
কুটিবারে সেই মৎস্য দিবেক তোমারে।
তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে॥
পুত্রবৎ পালিবা আপন প্রাণনাথ।
মা বলে যদ্যপি তবে কর্ণে দিবে হাত॥

শেষে তারে সম্মোহন আদি পঞ্চ বাণ।
শিখাইয়া পরিচয় দিয়া দিও জ্ঞান॥
শম্বরে বধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে।
কহিনু উপায় এইরূপে পতি পাবে॥
শুনি রতি সাত পাঁচ ভাবনা করিয়া।
নিবায় অনলকুণ্ড রোদন ত্যজিয়া॥
কামের উদ্দেশে চলে শম্বরের দেশ।
বেশ ভূষা রূপ ছাড়ি ধরি দাসীবেশ॥
শিবের বিবাহ সবে শুন ইতঃপর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিব বিবাহ যাত্রা

শিবের বিবাহ পরম উৎসাহ
সবে হৈলা যত্নবান।
পরম সন্তোষে দুন্দুভি নির্ঘোষে
ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান॥
নিজগণ লয়ে বরযাত্র হয়ে
চলিলা যত অমব।
অপ্সর নাচিছে কিন্নর গাইছে
পুলকিত মহেশ্বর॥
ব্রহ্মা পুরোহিত চলিলা ত্বরিত
বরকর্ত্তা নারায়ণ।
ইন্দ্রের শাসনে মরত ভুবনে
চলে যত রাজগণ॥
কুবের ভাণ্ডারী যক্ষগণ ভারি
নানা আয়োজন সাজি।
বায়ু করি বল আপনি অনল
হইলা আতস বাজি॥

নারদ রসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
সাজাইতে গেলা বর।
বসি ছিলা হর উঠিলা সত্বর
নারদ কহে তৎপর॥
জটাজূটে চূড়া সাপে বান্ধ খুড়া
মুকুটে কি দিবে শোভা।
কি কাজ মুক্তায় হাড়ের মালায়
কন্যার মা হবে লোভা॥
কস্তুরী কেশরে চন্দনে কি করে
ঘন করে মাখ ছাই।
কি করে মণিতে যে শোভা ফণীতে
হেন বর কোথা পাই॥
ফুলমালা যত শোভা দিবে কত
যে শোভা মুণ্ডের মালে।
কাপড়ে কি শোভা জগমনোলোভা
যে শোভা বাঘের ছালে॥
রথ হস্তী আর কি কাজ তোমার
যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যে গুণ কব কোটি গুণ
আমি মেনকার কাছে॥
অধিক করিয়া সিদ্ধি মিশাইয়া
ধুতুরা খাইতে হবে।
যাবত বিবাহ না হবে নির্ব্বাহ
উপবাস ভবে সবে॥
এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া
হর লয়ে মুনি যায়।
প্রেত ভূতগণ ধায় অগণন
আন্ধার কৈল ধূলায়॥

ঝুপ ঝুপ ঝাপ   দুপ দুপ দাপ
লম্ফ ঝম্প দিয়া চলে।
মহা ধূমধাম   হাঁক হুম হাম
জয় মহাদেব বলে॥
সহজে সবার   বিকট আকার
সহিতে না পারে আলো।
থাবায় থাবায়   মশাল নিবায়
আন্ধারে শোভিল ভালো॥
করতালি দিয়া   বেড়ায় নাচিয়া
হাসে হিহি হিহি হিহি।
দন্ত কড়মড়ি   করে জড়াজড়ি
লক লক লক জিহি।
করে চড়াচড়ি   ধায় রড়ারড়ি
কিলাকিলি গণ্ডগোল।
কে কারে আছাড়ে   কে কারে পাছাড়ে
কে মানে কাহার বোল॥
তরু উপাড়িয়া   গিরি উখাড়িয়া[2]
কৈল প্রলয়ের ঝড়।
বরযাত্রগণ   লইয়া জীবন
পলাইল দিয়া রড়॥
ইন্দ্রাদি পলায়   অন্য কেবা তায়
দেখিয়া আনন্দ হরে।
আগে ভাগে হরি   বিধি সঙ্গে করি
গেলা হেমন্তের ঘরে॥
হিমগিরিরাজ   করিয়া সমাজ
বসি পুরোহিত সাথ।

১। জাপটিয়া ধরে ;   ২। উৎপাটন করিয়া ;

বলদে চড়িয়া শিঙ্গা বজাইয়া
এলা বর ভূতনাথ ॥
যত কন্যাযাত্র দেখিয়া সুপাত্র
বলে এ কেমন বর।
বরযাত্রগণে দেখি ভয় মনে
না সরে কাবো উত্তর ॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকব ॥

শিববিবাহ

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
করবিলসিত নিশিত পরশু
অভয় বর কুরঙ্গিয়া ॥
লক লক ফণী জটবিরাজ
তক তক তক রজনিরাজ
ধক ধক ধক দহন সাজ
বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল
হুলু হুলু হুলু যোগিনীবোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনীরোল
প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া ॥
ভভম ভবম ববম ভাল
ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল
রুদ্র তালে তাল দেই বেং:ল
ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গভঙ্গিয়া।
সুরগণ কহে জয় মহেশ
পুলকে পূরল সকল দেশ

ভারত যাচত ভকতিলেশ
সরস অবশ অঙ্গিয়া ॥

সভামাঝে হিমালয় পূর্ব্বমুখ হয়ে।
বসিয়াছে দানসজ্জা বাম দিকে লয়ে ॥
উত্তরাস্তে রাখিয়াছে বরের আসন।
পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে ধীরগণ ॥
হেন কালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান ॥
বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি ॥
কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে।
ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে ॥
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া।
গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া ॥
বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম।
তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম ॥
কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত।
হেন কালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত ॥
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ।
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ ॥
হেঁট মুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা।
বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা ॥
স্মরহর বর বরপিতা পুরহর।
পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর ॥
শিব গোত্র শম্ভু শর্ব্ব শঙ্কর প্রবর।
শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর ॥

এরূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা।
স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা॥
কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে।
নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে॥
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া।
শিবকটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া॥
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনিডালা[1] হুলাহুলি দিয়া॥
বরের সমুখে মাত্র মেনকা আইলা।
পলাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা॥
গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিল গিয়া।
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া॥
বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়োগণ বলে ও মা এ কেমন বর॥
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই[2]॥
দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়।
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়॥
লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ।
মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ॥
শুন শুন এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও।
কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও॥
মেনকা নারদবাক্যে দুনা[3] মনদুখে।
পলাইতে গোবিন্দের পড়িলা সমুখে॥

১। বরণডালা; ২। প্রবেশ করি; ৩। দ্বিগুণ

দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায়।
আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায়॥
ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়।
হাত লাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়॥
ও রে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে[1]।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদার কথায় করিল হেন কাজ॥
ভারত কহিছে আর কি আছে আটক।
কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক॥

কন্দল ও শিবনিন্দা

আই আই ওই বুড়া কি
এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে
হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামরছটা
তামার শলা বুড়ার জটা
তাই বেড়িয়া ফোঁকায় ফণী
দেখে আসে জ্বর লো।
উমার মুখ চাঁদের চূড়া
বুড়ার দাড়ি শণের নুড়া
ছারকপালে ছাইকপালে
দেখে পায় ডর লো॥
উমার গলে মণির হার
বুড়ার গলে হাড়ের ভার

১। অলায়ু।

কেমন করে ও মা উমা
　　করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া
ভাঙ্গড় পাগল ওই লো বুড়া
ভারত কহে পাগল নহে
　　ওই ভুবনেশ্বর লো ॥

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে ॥
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকি।
আঁকশলী পোয়া[1] মোনা গড়ে মেকামেকি ॥
পাখ নাহি তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায় ॥
সেই ঢেঁকি চড়ে মুনি কান্ধে বীণা যন্ত্র।
দাড়ি লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র ॥
আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়েগুলা মাথা কোড়ে তোবে রক্ত দিব ॥
বেনা ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া।
এয়ো স্থুয়া[2] এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া ॥
ঘুরূলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরলে।
সেহাকুল কাঁটা[3] হাতে ঝাট এস চলে ॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয় ॥
নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল ॥
এ বলে উহারে সই ওটা বড় ঠেঁটা।[4]
আর জন বলে সই এই বটে সেটা ॥

১। ঢেঁকির অংশবিশেষ; ২। বিধবা; ৩। শিয়াকুল কাঁটা; ৪। বেহায়া।

যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা।
আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা॥
সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঢেঁটা।[১]
গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা॥
তার সই বলে থাক জানি লো উহারে।
পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখিঠারে॥
ইহার হইয়া কহে উহার মকর।[২]
গোবিন্দেরে দেখিয়াছে এ বড় পামর॥
চারিমুখা রাঙ্গাটা বরের ভাই হেন।
তার দিকে তোর দিদি চেয়ে রৈল কেন॥
সে বলে নাফানী[৩] আ লো না জান আপনা।
চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা॥
এইরূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি।
ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি॥
দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাসেন পশুপতি।
হেঁট মুখে মৃদু মন্দ হাসেন পার্ব্বতী॥
হর হর বলিয়া ডাকিছে ভূত যত॥
হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞানহত॥
ভূতভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে।
ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে॥
আহা মরি ও মা উমা সোনার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥
পায়ে পড়ে আমার উমার কেশপাশ।
বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ॥
আমার উমার দন্ত মুকুতাগঞ্জন।
বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥

১। দুষ্ট; ২। সমবয়স্কা সঙ্গিনীদ্বয়ের বন্ধুত্বজ্ঞাপক কৃত্রিম বা পাতানো নাম; ৩। যৌবনগর্ব্বিতা

উমার বদনচাঁদে পরকাশে রাকা।
বুড়ার বিকট মুখে দাড়ি গোঁফ পাকা॥
কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন।
ছাই মাখে অঙ্গে বুড়া এ কি অলক্ষণ॥
উমার গলায় জাতী মালতীর মালা।
বুড়ার গলায় হাড়মালা এ কি জ্বালা॥
বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে।
বাঘছাল পরে বুড়া আঁত উঠে গন্ধে॥
উমার রতনকাঞ্চী ভ্রমর গুঞ্জরে।
বুড়ার কোমরবন্ধ ফণী ফোঁস ধরে॥
নিছনি[1] করিতে গেনু লয়ে তৈল কুড়।[2]
সাপে খেয়েছিল প্রায় বাঁচালে গরুড়॥
আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে।
কেমনে উলঙ্গ হৈল শাশুড়ীর কাছে॥
আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়।
কপালে আগুন তার আলো করে তায়॥
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে।
সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে॥
বরযাত্র প্রেত ভূত দাঁড়াইয়া মূতে।
ভাগ্যবলে এয়োগণে না পাইল ভূতে॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দক্ষযজ্ঞ মনে করি নিন্দহ শঙ্কর॥

শিবের মোহন বেশ

আমার শঙ্কর করুণাকর গো
নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর॥

১। পূজা; ২। একপ্রকার ঔষধ।

কালকূট পিয়া বিশ্ব বাঁচাইয়া
মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হর।
কপালে অনল শিরে গঙ্গাজল
অনলে জলে সোঁসর॥
ভালে সুধাকর গলে বিষধর
সুধা বিষে বরাবর।
ভারত কহিছে মোরে না সহিছে
এ শিবে নিন্দে পামর॥

শিবনিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে।
দক্ষেরে হইল মনে উমারে না সহে॥
যে দুঃখে দক্ষের ঘরে ত্যজিলাম কায়।
এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায়॥
হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই॥
কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ।
কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ॥
মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়।
মনোহর বর হরে দেখিবারে পায়॥
জটাজূট মুকুট দেখিলা ফণিমণি।
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণী॥
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ।
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ॥
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই॥
এইরূপে হরগৌরী বিবাহ হইল।
হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল॥

কুতূহলে হুলাহুলি দেয় এয়োগণ।
ঋষিগণ বেদগানে পুরিল ভুবন॥
কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অপ্সর।
অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর॥
উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।
বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস॥
নিত্যসখী আসি জয়া বিজয়া মিলিল।
ডাকিনী যোগিনী আদি যে যেখানে ছিল
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

সিদ্ধিঘোটন

বড় আনন্দ উদয়।
বহু দিনে ভগবতী আইলা আলয়॥
শঙ্খঘণ্টারব মহামহোৎসব
ত্রিভুবনে জয় জয়।
নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক
রাগ তাল মান লয়॥
যত চরাচর হরিষ অন্তর
পরম আনন্দময়।
রায় গুণাকর কহে পুটকর
মোরে যেন দয়া হয়॥

উমা পেয়ে মহেশের বাড়িল আনন্দ॥
নন্দীরে কহেন কথা হাসি মৃদুমন্দ॥
শুন শুন অরে নন্দি তুমি বড ভক্ত।
সিদ্ধি ঘুটি দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত॥
এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই।
বুদ্ধিহারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই॥

ফাঁফর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো।
ভেভাচাকা[১] লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো[২] ॥
নূতন ঘোটনা কুঁড়া[৩] দিয়াছে বিশাই[৪]।
আজি বড় শুভ দিন বার কর তাই ॥
এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর।
সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার ॥
যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া।
ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া ॥
তদবধি গৃহ শূন্য সিদ্ধি নাহি জানি।
আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি ॥
অল্প করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বার।
ধুতুরার ফল তাহে যত দিতে পার ॥
মহুরী মরিচ লঙ্গ প্রভৃতি মশলা।
অধিক করিয়া দিয়া করহ রসলা ॥
দুগ্ধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা।
দুধ কুসুম্ভায়[৫] আজি হয়েছে বাসনা ॥
ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত।
সকলে প্রসাদ পাবে ঘোট-তারি মত ॥
শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে।
নূতন ঘোটনা কুঁড়া আনিল যতনে ॥
বাছিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া গুঁড়া।
ধুইয়া গঙ্গার জলে পূর্ণ হৈল কুঁড়া ॥
দু হাতে ঘোটনা দুই পায়ে কুঁড়া ধরি।
ত্রিপুরমর্দ্দন নাম মনে মনে স্মরি ॥
তাকে পাকে ঘোটনায় আরম্ভিলা পাক।
ঘর্ঘর ঘুঙ্গান ঘোর ঘন ঘন ডাক ॥

১। হতভম্ব; ২। কিংকর্তব্যবিমূঢ়; ৩। সিদ্ধি ঘুঁটিবার আধার;
৪। বিশ্বকর্মা; ৫। সিদ্ধিদ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার খাদ্যসামগ্রী।

রাশি রাশি তাল তাল পর্ব্বতপ্রমাণ।
গঙ্গাজলে ঘুলি কৈল সমুদ্র সমান ॥
সিদ্ধি ঘোটা হৈল হর হাসেন হরিষে।
বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাকিবেন কিসে ॥
হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল।
ভারত কহিছে আর ছাকিয়া কি ফল ॥

সিদ্ধিভক্ষণ

মহাদেবের আঁখি ঢুলু ঢুল।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল ভুল ॥
নয়নে [illegible] রঙ্গ অলসে অবশ অঙ্গ
লটপট জটাজুট গঙ্গা হুল থুল।
খসিল বাঘের ছাল আলু থালু হাড়মাল
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল ॥
হাসি হাসি উতরোল আধ আধ আধ বোল
ন ন্ন নন্দি নন্দি আ আ আন ন্ন নকুল[1]।
ভারতের অনুভবে ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরাকুল ॥

সিদ্ধি ঘুটি আনি নন্দী অন্তরে দাঁড়ায়।
বেতাল ভৈরবগণ নাচিয়া বেড়ায় ॥
সমুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন।
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন ॥
অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্র ভাগ লয়ে।
ভবানীর নামে দিল একভাব হয়ে ॥
ছোঁয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ।
একই নিশ্বাসে পিয়া করিলা নিঃশেষ ॥

১। সিদ্ধিপানের পর [illegible]।

হুঙ্কার ছাড়িয়া রসে মগন হইয়া।
আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া॥
নকুল করিব কি রে কহেন নন্দীরে।
ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে॥
তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত।
মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিঞ্চিত॥
হাসিয়া কহেন হর ভালা মোর ভাই।
বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই॥
অসংখ্য মেলানী ভার নকুলে উড়িল।
সহচরগণ সবে ভাবিতে লাগিল॥
শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও।
সকলে সিদ্ধির শেষ পরসাদ পাও॥
সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত কিঞ্চিত।
সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত॥
আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা।
নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা॥
ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ।
অগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ॥
এমন মেলানীভার দিল আই বুড়ী[1]।
জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি॥
আমরা নকুল করি এমন কি আছে।
তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে॥
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব।
তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব॥
আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাঁই।
যে বুঝি তাহার চালে খড় রবে নাই॥

১। বুড়ী মা।

তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাইলে।
ফুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে॥
কে বলে মেলানীভারে[১] নাহি আয়োজন।
আন রে মেলানীভার দেখিব কেমন॥
মায়া কৈলা মহামায়া মায়ের কারণ।
পূরিল মেলানীভার পূর্ব্বের যেমন॥
দেখিয়া আনন্দ ভূত ভৈরব সকলে।
খাইতে লাগিল সবে মহাকুতূহলে॥
জয় জয় হর গৌরী বলিয়া বলিয়া।
নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরগৌরীর কথোপকথন

আমারে ছাড়িও না। ভবানি।
সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া
শিলাময় হিয়া হইও না।
এ ঘোর পাথারে ফেলিয়া আমা.র
দোষ বারে বারে লইও না॥
শিশুগণ মিলা যেন খেলা দিলা
তেমন এখানে খেলিও না।
তব মায়াছান্দে বিশ্ব পড়ি কান্দে
ভারতে এ ফেরে ফেলিও না॥

আনন্দসাগরে হর মগন হইলা।
বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা॥

১। বিদায়ের সময় প্রদত্ত উপহারদ্রব্য।

তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বসার।
কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার॥
দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।
এত দিন ছিলা গিয়া হেমন্তের[১] বাড়ী॥
ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আর বার।
সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥
হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই।
শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই॥
অর্দ্ধ অঙ্গ তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে।
হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥
হাসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে।
তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥
অর্দ্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥
শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম।
তোমার সহিত নহে এমন মরম॥
তোমার শরীর আমি মাথায় করিয়া।
দেখিয়াছ ফিরিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া॥
চক্র করি চক্রপাণি চক্রেতে কাটিয়া।
মোর মাথা হৈতে তোমা দিলা ছাড়াইয়া॥

১। হিমালয়।

অঙ্গ প্রতিঅঙ্গ তব পড়িল যেখানে।
ভৈরব হইয়া আমি রয়েছি সেখানে॥
তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া।
আর বার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া॥
শুনিয়া কহেন দেবী সহাস্য বদনে।
সমভাবে দোঁহে এক হইবে কেমনে॥
পাঁচ মুখ তোমাব আমার এক মুখ।
সমভাবে অর্দ্ধ ভাগে তুমি পাবে দুখ॥
দশ হাত তোমার আমার দুটি হাত।
সমভাবে অর্দ্ধ ভাগে হইবে উৎপাত॥
শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব্ব সমাচার।
এক মুখ দুই হাত আছিল আমার॥
ঊর্দ্ধ মুখে আগমে তোমার গুণ গাই।
দুই ভুজ ঊর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই॥
চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে।
চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে॥
পঞ্চ তালে নাচিতে অধিক আট হাত।
দিয়াছ আপনি পূর্ব্বে নিন্দহ পশ্চাত॥
এত বলি একমুখ দ্বিভুজ হইলা।
সাক্ষী করি এক মুখ রুদ্রাক্ষে রাখিলা॥
হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান।
হরগৌরী এক হই ইতে নাহি আন॥
দুই জনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে॥
এইরূপে হরগৌরী করেন বিহার।
গজানন ষড়ানন হইল কুমার॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরগৌরী রূপ

কি এ নিরূপম　　　　শোভা মনোরম
　　হর গৌরী এক শরীরে।
শ্বেত পীত কায়　　　　রাঙ্গা দুটি পায়
　　নিছনি[1] লইয়া মরি রে ॥

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে
আধ পটাম্বর[2] সুন্দর সাজে
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে
　　আধ ফণিফণা ধরি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা
আধ মণিময় হার উজালা
আধ কণ্ঠে শোভে গরল কালা
　　আধই সুধামাধুরী রে ॥
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ
এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ
　　আধই তাম্বুল পূরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন
কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন
　　আধই সিন্দূর পরি রে ॥
কপাল লোচন আধই আধে
মিলি এক হইল বড়ই সাধে
দুই ভাগে অগ্নি এক অবাধে
　　হইল প্রণয় করি রে

১। অভত ; বরণডালা ; উপহার ;　　২। পট্টবস্ত্র

দোঁহার আধ আধ আধ শশী
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি
আধ জটাজূটে গঙ্গা সরসী
আধই চারু কবরী রে ॥
এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল
এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল
আধই গন্ধকস্তুরী রে।
ভারত কবি গুণাকর রায়
কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়
হরগৌরী বিয়া পালা হইল সায়
সবে বল হরি হরি রে ॥

কৈলাসবর্ণন

কৈলাস ভূধব অতি মনোহর
কোটি শশী পবকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নব যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সবগণের বাস ॥
রজনী বাসব মাস সংবৎসর
দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ
সুখ দুঃখ একাকার ॥
তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত ॥
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে।

কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে ॥
মৃগ পালে পাল শার্দ্দূল রাখাল
কেশরী হস্তিরাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে
ইন্দুরে পোষে বিড়াল ॥
সব পিয়ে সুধা নাহি তৃষা ক্ষুধা
কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক
সার অসার সংসারে ॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম
ছোট বড় সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাঁই
কেবল কৈবল্য[১] মূল ॥
চৌদিকে দুস্তর সুধার সাগর
কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদীপরে চিন্তামণি ঘরে
বসি গৌরী ত্রিপুরারি ॥
শিব শক্তি মেলা নানা রসে খেলা
দিগম্বরী দিগম্বর।
বিহার যে সব সে সব কি কব
বিধি বিষ্ণু অগোচর ॥
নন্দী দ্বারপাল ভৈরব বেতাল
কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ
গণিতে কার শকতি ॥

১। পরমাত্মাতে বিলীন হওয়ার নাম কৈবল্য।

এক দিন হর ক্ষুধায় কাতর
গৌরীরে কহিলা হাসি।
ভারত ব্রাহ্মণ করে নিবেদন
দয়া কর কাশীবাসি॥

হরগৌরীর বিবাদসূচনা

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে।
বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে॥
এ বড় বিষম ধন্দ
যত করি ছন্দ বন্দ
ভাল ভাবি হয় মন্দ
পড়িনু প্রমাদে।
ধর্ম্মে জানি সুখ হয়
তবু মন নাহি লয়
অধর্ম্মে বিবিধ ভয়
তবু তাই স্বাদে॥
মিছা দারা সুত লয়ে
মিছা সুখে সুখী হয়ে
যে রহে আপনা কয়ে
সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের
আর সব মিছা ফের
ভারত পেয়েছে টের
গুরুর প্রসাদে॥

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥

নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই ॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল ॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারী ॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥
কিবা শুভ ক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর।
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর ॥
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা ॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥
পরম্পরা পরম্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥
এইরূপে দুই জনে বাড়িছে বাকছল।
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল ॥

হরগৌরীকন্দল

কেবা এমন ঘরে থাকিবে। জয়া।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে ॥

আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল[১] দুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে॥
বিষপানে নাহি লয় কথা কৈতে ভয় হয়
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা বাপ পাষাণ-হিয়া ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া
ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে॥

শিবার হইল ক্রোধ শিবেব বচনে।
ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে॥
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের নাহিক সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক[২]॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দূকের কুঁজি[৩]॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥
কেমনে এমন কন লাজ ই হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥

১। ছাওয়াল; ছেলে; শিশু;
২। উইচিঁপি; ৩। চাবি।

অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই ॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোব তরে কত ধন লয়ে ॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু ॥
তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ ॥
উহাঁব ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা ॥
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান ॥
ভিক্ষা মাগি খুদ কোণ[1] যে পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর ॥
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ুরে উড়ায় ॥
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘবে আমি মাত্র এই অলক্ষণ ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে ॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া[2] ॥
ভারত কহিছে মা গো কত বল আর।
শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার ॥

১। খুদ ;
২। অদ্ভুত ;

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্‌যোগ

ভবানীর কটূভাষে লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥
হেঁটমুখে পঞ্চানন নন্দীরে ডাকিয়া কন
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আনি শিঙ্গা হাড়মাল ডমরু বাঘের ছাল
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥
আন রে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকলগুলি
যতগুলি ধুতুবার ফল।
থলি ভরা সিদ্ধিগুঁড়া লহ রে ঘোটনা কুঁড়া
জটায় আছয়ে গঙ্গাজল॥
ঘর উজাড়িয়া[1] যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা[2] সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস॥
বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার॥
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া॥

১। উজাড় করিয়া; ২। উন্মার্গগামিনী; এস্থলে কলহপরায়ণা।

শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি
কি করিব একা ঘরে রয়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে॥
যে ঘরে গৃহস্থ হেন সে ঘরে গৃহিণী কেন
নাহি ঘরে[১] সদা খাই খাই।
কি করে গৃহিণীপনে খন খন ঝন ঝনে
আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই॥
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচমচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত
ভিক্ষা মাগা নৈব চ নৈব চ॥
হইয়া বিরসমন লয়ে গুহ গজানন
হিমালয়ে চলিলা অভয়া।
ভারত বিনয়ে কয় এমন উচিত নয়
নিষেধ করিয়া কহে জয়া॥

জয়ার উপদেশ

কহে সখী জয়া শুন গো অভয়া।
এ কি কর ঠাকুরালি[২]।
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপঘর
খেয়াতি হবে কাঙ্গালী॥
মিছা ক্রোধ করি আপনা পাসরি
কি কর ছাবাল খেলা।
সুখমোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম
সংসার সাগরে ভেলা॥

১। অভাবযুক্ত ঘরে। ২। মহত্ত্ব।

অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন দেহ কয়ে
দাঁড়াবে কাহার কাছে।
দেখিয়া কাঙ্গালী সবে দিবে গালি
রহিতে না দিবে নাছে[১] ॥
জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া ॥
যা বলি তা কর নিজ মূর্ত্তি ধর
বস অন্নপূর্ণা হয়ে।
কৈলাসশিখর অন্নে পূর্ণ কর
জগতের অন্ন লয়ে ॥
তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে
যত যত অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া আনহ হরিয়া
রাখহ আপন কাছে ॥
কমল আসন আদি দেবগণ
কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ।
কমলা প্রভৃতি যতেক প্রকৃতি
এই স্থানে দেহ ভক্ষ্য ॥
ফিরি ঘরে ঘর হইয়া ফাঁফর
কোথাও অন্ন না পেয়ে।
আপনি শঙ্কর আসিবেন ঘর
তোমার এ গুণ গেয়ে ॥
অন্ন দিয়া তাঁরে সকল সংসারে
আপনা প্রকাশ কর।

১। নাছদুয়ার ; সুমুখদরজা।

প্রকাশিয়া তন্ত্রে অন্নপূর্ণামন্ত্রে
লোকের যন্ত্রণা হর ॥
তিন ভূমণ্ডলে পূজিবে সকলে
চৈত্র শুক্লা অষ্টমীতে ।
দ্বিতীয়া অন্বিত[1] অষ্টাহ সঙ্গীত
বিসর্জ্জন নবমীতে ॥
পূজিবে যে জনে তাহার ভবনে
হইবে লক্ষ্মী অচলা ।
আর যত আছে সব হবে পাছে
কহিবে অষ্টমঙ্গলা ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ দেবীপুত্ররূপ
অন্নপূর্ণা ব্রতদাস ।
ভারত ব্রাহ্মণ কহে সুবচন
অন্নদা পুরাও আশ ॥

অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ

অন্নপূর্ণা জয় জয় ।
দূর কর ভবভয় ॥
তুমি সর্ব্বময় তোমা হৈতে হয়
সৃজন পালন লয় ।
কত মায়া কর কত কায়া ধর
বেদের গোচর নয় ॥
বিধি হরি হর আদি চরাচর
কটাক্ষেতে কত হয় ।
ছাড় ছায়া মায়া দেহ পদছায়া
ভারত বিনয়ে কয় ॥

১। যুক্ত ; মিলিত ।

জয়ার বচনে দেবী মানিয়া প্রবোধ।
বসিলেন হাস্যমুখী দূরে গেল ক্রোধ॥
বিশাই বিশাই বলি করিলা স্মরণ।
জোড়হাতে বিশ্বকর্ম্মা দিলা দরশন॥
শুন রে বিশাই বাছা লহ মোর পান।
পানপাত্র হাতা দেহ করিয়া নির্ম্মাণ॥
মর্ম্ম বুঝি বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাবামাত্র।
রতননির্ম্মিত দিলা হাতা পানপাত্র॥
রতনমুকুট দিলা নানা অলঙ্কার।
অমূল্য কাঁচুলি শাড়ী উড়ন্নি যে আর॥
বসিবারে মণিময় দিলা কোকনদ।
আশিস করিলা মাতা হও নিরাপদ॥
মায়া কৈলা মহামায়া কহিতে কে পারে।
হরিলা যতেক অন্ন আছিল সংসারে॥
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি নারায়ণ।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি পদ্মাসন॥
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি মৃত্যুঞ্জয়।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি হরি হয়॥
দেব দেবী ভুজঙ্গ কিন্নর আদি যত।
সৃষ্টি কৈলা কোটি কোটি কোটি কোটি শত॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইল এক ঠাঁই।
কেমন হইল মেনে মনে আসে নাই॥
অন্নের পর্ব্বত পরমান্নসরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি সাগর সাগর॥
কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায়।
কোলাহল গণ্ডগোল কহা নাহি যায়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কলরব এক ঠাঁই।
জয় জয় অন্নপূর্ণা বিনা শব্দ নাই॥

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের ভিক্ষাযাত্রা

জয় শিব নাচহি পাঁচহি তালা।
বাজত ডমরু পিনাক রসালা॥
নাচত ভূত বাজাওত ভৈরব
গাওত তাল বেতালা।
নন্দী কহে তাতা- কার মনোহর
ভৃঙ্গী বাজাওত গালা॥
গঙ্গা ঝরে জল চাঁদ সুধারস
অনল হলাহল জ্বালা।
ভারতকে হর শঙ্কর মূরতি
নাশ কপাল কপালা॥

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥
ববম্ ববম্ বম ঘন বাজে গাল।
ভভম্ ভভম্ ভম শিঙ্গা বাজে ভাল॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে।
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে॥
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা[1]॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ[2]।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥

১। রঙ্গ-তামাসাপ্রিয় ছেলেছোকরা; ২। কৌতুককারী।

কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥
আর আর দিন তাহে হাসেন গোঁসাই।
ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই॥
চেত রে চেত রে চিত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব॥
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া॥
আজি মেনে ফিরে মাগ শঙ্কর ভিখারী।
কালি আস দিব অন্ন আজি ত না পারি॥
এইরূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর ঘর।
অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর॥
ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মীনারায়ণ॥
আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর।
ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁফর॥

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি।
কহিতে না বাক্য সরে　　অন্ন নাহি মোর ঘরে
আজি বড় দৈবের দুর্গতি ॥
আমি লক্ষ্মী সর্ব্বঠাঁই　　মোর ঘরে অন্ন নাই
ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে।
শুনিয়া শঙ্কর কন　　ফিরিলাম ত্রিভুবন
এই কথা সকলের ঘরে ॥
গুমান[১] হইল গুঁড়া　　না মিলিল খুদ কুঁড়া
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাভেতে যদ্যপি চায়　　সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া ॥
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই　　আর যাব কার ঠাঁই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই।
গলে সাপ বান্ধি চাই　　তবু অন্ন নাহি পাই
কপালে দিলেক বিধি ছাই ॥
কত সাপ আছে গায়　　হাভাতেরে নাহি খায়
গলে বিষ সেহ নাহি বধে ॥
কপালে অনল জ্বলে　　সেহ না পোড়ায় বলে
না জানি মরিব কি ঔষধে ॥
ঘরে অন্ন নাহি যার　　মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাধ।
যার নারী সুতা সুত　　সদা অন্নকষ্টযুত
সর্ব্বদা তাহার অবসাদ।
দেখিয়া শিবের খেদ　　লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ
কেন শিব করহ বিষাদ।

১। গর্ব্ব; দেমাক।

অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ ॥
গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে
কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে
তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা ॥
আমার যুকতি ধর কৈলাস গমন কর
আমি আদি সকলি সেখানে।
তোমারে কবার তবে আমি আছিলাম ঘরে
এই আমি যাই সেইখানে ॥
এত বলি হরিপ্রিয়া কৈলাসে রহিলা গিয়া
শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া।
দেখি অন্নদার সাজ শিবের হইল লাজ
তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া ॥
কত কোটি হরি হর পদ্মাসন পুরন্দর
কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত।
সুখে নানা রস খায় স্তুতি পড়ে নাচে গায়
দেখি শিব হইলা মোহিত ॥
দেখি কোটি কোটি হরে স্থাণু স্থাণু হৈলা ডরে
অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া।
ভারতের উপরোধে বিসর্জ্জন দিয়া ক্রোধে
অন্ন দিলা নিকটে আনিয়া ॥

শিবে অন্নদান

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন ॥
কারণ-অমৃত পূরিত করি।
ব্রহ্ম-পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী ॥

সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিষে মাতা॥
পঞ্চ মুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাদের[১] মত॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টকপর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চূষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥
লটপট জটা লপটে পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক ধক ধক ভালে অনল।
তর তর তর চাঁদমণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দলমল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
ববম ববম বাজয়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥

১। আহ্লাদ; সাধ।

ভভম ভভম বাজয়ে শিঙ্গা।
মৃদঙ্গ বাজয়ে তাথিঙ্গা থিঙ্গা॥
পঞ্চ মুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে॥
নাটক[১] দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥
অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে।
ভারত ভুলিল ভবের নাচে॥

অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য

জয় জগদীশ্বর জয় জগদম্বে।
ভব ভববাণী ভব অবলম্বে॥
শিব শিবকায়া হর হরজায়া
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে।
যদি কর মমতা হত হয় যমতা
দিবি ভুবি সমতা গুহ হেরম্বে॥
তব জন যেবা তসু[২] রিপু কেবা
যম দেই সেবা শিরপরিলম্বে।
ভবজল তরণে রাখহ চরণে
ভারত চরণে করি কাদম্বে॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা আপনা প্রকাশি।
হরিলা যতেক মায়া মহামায়া হাসি॥
বসিলা গিরিশ গৌরী কৌতুক অশেষ।
সমুখে করেন ক্রীড়া কার্ত্তিক গণেশ॥

১। রঙ্গতামাসা; ২। তাহার।

দু দিকে বিজয়া জয়া নন্দী দ্বারপাল।
ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল ॥
অন্নপূর্ণামহিমা দেখিয়া মহেশ্বর।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র বহুতর ॥
উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন ॥
বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কব কত।
কিঞ্চিত কহিনু নিজ বুদ্ধিশুদ্ধিমত ॥
যে জন করয়ে অন্নপূর্ণা উপাসনা।
বিধি হরি হর তার করয়ে মাননা ॥
ইহলোকে নানা ভোগ করে সেই জন।
পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন ॥
অন্নপূর্ণা মহামায়া মহাবিদ্যামাজ।
যার বরে স্বর্গে লক্ষ্মী ইন্দ্র দেবরাজ ॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব যার করি উপাসনা।
বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব যার করিয়া মাননা ॥
শিবের শিবত্ব যার উপাসনাফলে।
নিগম আগমে যারে আদ্যা শক্তি বলে ॥
দয়া কর দয়াময়ী দানবদমনী।
দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দারিদ্র্যদলনী ॥
হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্বজননী।
হে মহীরাহারময়ী হিরণ্যবরণী ॥
হইলা নন্দের সুতা হরিসহায়িনী।
হেরি হাহাকার হর হরিণীহেরিণী ॥
কামরিপু কামিনী কামদা কামেশ্বরী।
করুণা কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি ॥
রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল ॥

গায়নে বায়নে[১] মা গো মাগি এই বর।
অন্নে পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর ॥
শুনিতে মঙ্গল তব যার ভক্তি হয়।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার স্থির যেন রয় ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা

পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত বরুণা অসি
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিতা।
আনন্দকানন নাম কেবল কৈবল্যধাম
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিতা ॥
বাপী যাহে জ্ঞানবাপী নামে মোক্ষ পায় পাপী
মহিমা কহিতে কেবা পারে।
মণিকর্ণী পুষ্করিণী মোক্ষপদবিধায়িনী
সার বস্তু অসার সংসারে ॥
দশাশ্বমেধের ঘাট চৌষট্টি যোগিনী পাট
নানা স্থানে নানা মহাস্থান।
তীর্থ তিন কোটি সাড়ে এক ক্ষণ নাহি ছাড়ে
সকল দেবের অধিষ্ঠান ॥
মহেশের রাজধানী দুর্গা যাহে মহারাণী
যাহে কালভৈরব প্রহরী।
শমনের অধিকার না হয় স্মরণে যার
ভবসিন্ধু তরিবার তরি ॥
যাহে জীব ত্যজি জীব সেই ক্ষণে হয় শিব
পুন নহে জঠরযাতনা।

১। বাজকর।

দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দনুজ মনুজ রক্ষ
সবে যার করয়ে মাননা ॥
শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত যাহে সদা অধিষ্ঠিত
যাহাতে প্রধান বিশ্বেশ্বর।
যত যত যশোধাম প্রকাশি আপন নাম
শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর ॥
দেবতা কিন্নর নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
তপস্যা করয়ে মোক্ষ আশে।
দেখিয়া কাশীর শোভা মহেশের মনোলোভা
বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে ॥
সর্ব্বসুখময় ঠাঁই সবে মাত্র অন্ন নাই
দেখিয়া ভাবেন সদাশিব।
অনেকের হৈল বাস সকলের অন্ন আশ
কি প্রকারে অন্ন যোগাইব ॥
আপন আহার বিষ ধ্যানে যায় অহর্নিশ
অন্ন সনে নাহি দরশন।
এখানে বসিবে যারা অন্নজীবী হবে তারা
অন্ন বিনা না রবে জীবন ॥
এত ভাবি ত্রিলোচন সমাধিতে দিয়া মন
বসিলেন চিন্তাযুক্ত হয়ে।
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে অন্নে পূর্ণ কর স্থানে
ভারত দিলেন যুক্তি কয়ে ॥

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি

ভব ভাবি চিতে পুরী নির্ম্মাইতে
বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
বিশ্বকর্ম্মা আসি প্রবেশিলা কাশী
জোড়হাতে সাবধান ॥

বিশ্বকর্ম্মে হর কহিলা সত্বর
শুন রে বাছা বিশাই।
অন্নপূর্ণা আসি বসিবেন কাশী
দেউল দেহ বানাই ॥
বিশ্বকর্ম্মা শুনি নিজ পুণ্য গুণি
দেউল কৈলা নির্ম্মাণ।
অন্নদা মূরতি নিরুপম অতি
নিরমায় সাবধান ॥
রতন দেউল ভুবনে অতুল
কোটি রবি পরকাশ।
বিবিধ বন্ধান অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ
দেখি সুখী কৃত্তিবাস ॥
দেউল ভিতরে মণিবেদীপরে
চিন্তামণির প্রতিমা।
চতুর্ব্বর্গপ্রদা গড়িল অন্নদা
অনন্ত নামমহিমা ॥
মণিময়চ্ছদ গড়ে কোকনদ
অরুণচিকণশোভা।
ভুবনমণ্ডল করয়ে উজ্জ্বল
মহেশের মনোলোভা ॥
তাহার উপরি পদ্মাসন করি
অন্নদামূরতি গড়ে।
পদতল রঙ্গে দেখি অষ্ট অঙ্গে
অরুণ চরণে পড়ে ॥
অতি নিরমল চরণ যুগল
সুশোভিত নখ ছাঁদে।
দিনে দিনে ক্ষীণ কলঙ্কে মলিন
কত শোভা হবে চাঁদে ॥

মণিকরিকর উরু মনোহর
নিতম্বে রত্নকিঙ্কিণী।
ত্রিবলীর ভঙ্গে অনঙ্গের অঙ্গে
বান্ধি রাখে মাজা ক্ষীণী॥
শোভাসরোবর নাভি মনোহর
মদনশফরীধাম।
কামের কুন্তল অতি সুকোমল
রোমাবলী অভিরাম॥
স্বয়ম্ভু শঙ্কর উচ কুচবর
সুধাসিন্ধু বিম্বরাজে।
রতনকমল মৃণাল কোমল
সুবলিত ভুজ সাজে॥
কারণ অমৃত পলান্ন সঘৃত
পানপাত্র হাতা শোভে।
সমুখে শঙ্কর নাচেন সুন্দর
অন্ন খেয়ে অন্নলোভে॥
কোটি সুধাকর বদন সুন্দর
রতন মুকুট শিরে।
অর্দ্ধ শশী ভালে কেশ মল্লীমালে
অলি মধুলোভে ফিরে॥
অন্নদা মূরতি দেখি পশুপতি
বিশাইরে দিলা বর।
কৃষ্ণচন্দ্র মত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর॥

অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মাণ

কি এ শোভা হয়েছে কাশীমাঝে ॥
দেখ রে আনন্দ কাননশোভা।
সরোবর মনোহর হরমনোলোভা ॥

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল।
চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মাইল ॥
সমুখে করিলা সরোবর মনোহর।
মাণিকে বান্ধিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর ॥
সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ।
দিয়া কৈল চারি পাড় অতি সুশোভন ॥
তুলিল পাতালগঙ্গা ভোগবতীজল।
সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্ম্মল ॥
গড়িল স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ।
প্রবালে গড়িল ঠোঁট সুরঙ্গ চরণ ॥
সূর্য্যকান্ত মণি দিয়া গড়িল কমল।
চন্দ্রকান্ত মণি দিয়া গড়িল উৎপল ॥
নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকরপাঁতি।
নানা পক্ষী জলচর গড়ে নানা ভাতি ॥
ডাহুকা ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারসা সারসী গড়ে বক বকীগণ ॥
তিত্তিরী তিত্তিরা পানিকাক পানিকাকী।
কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী ॥
কাদাখোঁচা দলপিপী কামি . গাড়া কঙ্ক।
পানিভর বেণেবউ গড়ে মৎস্যরঙ্ক ॥
হাঙ্গর কুম্ভীর গড়ে শুশুক মকর।
নানা জাতি মৎস্য গড়ে নানা জলচর ॥

চীতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল।
বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল ॥
পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।
গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা ॥
মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।
কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই ॥
শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা।
চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা ॥
গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।
খরশুল্লা তপসিয়া গাঙ্গাস ইলিশা ॥
চারি পাড়ে বিকর্ম্মা নির্ম্মায় উদ্যান।
নানা জাতি বৃক্ষ গড়ে সুন্দর বন্ধান ॥
অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর।
করবীর গন্ধরাজ বকুল টগর ॥
শেহলী পীয়লী দোনা পারুল রঙ্গন।
মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন ॥
জবা জূতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন।
চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতি সুশোভন ॥
কনকচম্পক ভূমিচম্পক কেতকী।
চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী ॥
কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকেলি কুন্দ।
পারিজাত মধুমল্লী ঝিটী মুচকুন্দ ॥
আম জাম নারিকেল জামীর কাঁটাল।
খাজুর গুবাক শাল পিয়াল তমাল ॥
হিজোল তেঁতুল তাল বিল্ব আমলকী।
পাকুড় অশ্বথ বট বালা হরিতকী ॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ ফুলফলধর।
তার শোভা হেতু গড়ে বিহঙ্গ বিস্তর ॥

ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকাতুয়া।
চাতক চকোর গুরী তুরী রাঙ্গচুয়া॥
ময়ুর ময়ুরী সারী শুক আদি খগ।
কোকিল কোকিলা আদি রসাল বিহগ॥
সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী।
কাহাকুহী লগড় ঝগড় জোড়াধূতী॥
শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল।
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল॥
ঠেটী ভেটী ভাটা হরিতাল গুড়গুড়।
নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড়॥
বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল।
ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল॥
চড়ুই মণিয়া পাবদুয়া টুনটুনি।
বুলবুল জল আদি পক্ষী নানা গুণি॥
বউ কথা কহ আর দেশের কি হবে।
বনশোভা যে সব পক্ষীর কলরবে॥
ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি।
গড়িয়া গড়িছে পশু বিবিধ আকৃতি॥
সরভ কেশরী বাঘ বারণ গণ্ডার।
ঘোড়া উট মহিষ হরিণ কালসার॥
বানর ভালুক গরু ছাগল শশারু।
বরাহ কুক্কুর ভেড়া খটাস সজারু॥
ঢোলকান খেঁকি খেঁকশেয়ালি ঘোড়ারু।
বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তুরী তুলারু॥
গাধা গোধা হাপা হাউ চমরী শৃগাল।
হোড়ার নকুল গোলা গবয় বিড়াল॥
কাকলাস খেড়ে মূষা ছুঁচা আজনাই।
সৃষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে গড়িলা বিশাই॥

বনমানুষাদি গড়ি মনে বাড়ে রঙ্গ।
নানামত নানা জাতি গড়িছে ভুজঙ্গ॥
কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল।
বোড়া চিতি শঙ্খচূড় সূঁচে ব্রহ্মজাল॥
শাঁখিনী চামর কোষা সুতার সঞ্চার।
খড়ীচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার॥
তক্ষক উদয়কাল ডাড়াশ কানাড়া।
লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতাছাড়া॥
ছাতারে শীয়ড়চাঁদা নানাজাতি বোড়া।
ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতী ঢোঁড়া॥
বিছা বিছুপিপিড়া প্রভৃতি বিষধর।
সৃষ্টিহেতু জোড়ে জোড়ে গড়িল বিস্তর॥
সরোবর বনশোভা দেখি সুখী শিব।
জীবন্যাসমন্ত্রেতে[১] সবার দিলা জীব॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

দেবগণনিমন্ত্রণ

চল কাশী মাঝে সবে যাব।
অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব॥
মণিকর্ণিকার জলে স্নান করি কুতূহলে
অন্নদামঙ্গল ছলে হরগুণ গাব।
পাপ তাপ হবে ছন্নে নানা রস সুসম্পন্ন
অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব॥
শিব শিব শিব কয়ে জ্ঞানবাপীকূলে রয়ে
সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না যাব।

১। দেবমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র।

শিবের করুণা হবে দেখিব ভবানীভবে
ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব ॥

শিবের আনন্দ অন্নপূর্ণা আরাধনে।
নিমন্ত্রণ করিলা সকল দেবগণে ॥
হংসপৃষ্ঠে আইলা সগণ প্রজাপতি।
গণ সহ বিষ্ণু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
গণ সহ গণেশ আইলা গজানন।
দেবসেনা সঙ্গে লয়ে দেব ষড়ানন ॥
দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ।
ইন্দ্রাণী আইলা সঙ্গে দেবীর সমাজ ॥
নিজগণ সঙ্গে করি অনল আইলা।
পরিবার সঙ্গে যম আসিয়া মিলিলা ॥
নৈর্ঋত আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ।
বার্ত্তা পেয়ে বরুণ আইলা ততক্ষণ ॥
সগণ পবনবেগে আইলা পবন।
কুবের আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ ॥
শিবের বিশেষমূর্ত্তি আইলা ঈশান।
মূর্ত্তিভেদে প্রজাপতি আইলা বেগবান্ ॥
আইলা ভুজঙ্গপতি ত্যজিয়া পাতালে।
আদর করিলা শিব দেখি দিক্‌পালে ॥
দ্বাদশ মূরতি সহ আইলা ভাস্কর।
ষোল কলা সহিত আইলা শশধর ॥
আপন মঙ্গল হেতু মঙ্গল আইলা।
বিবুধ সহিত বুধ আসিয়া মিলিলা ॥
দেবগণগুরু আইলা গুরু ভট্টাচার্য্য।
দৈত্যগুরু মহাকবি আইলা শুক্রাচার্য্য ॥

মন্দগতি মহাবেগে আইলা শনৈশ্চর।
আইলা রাহু কেতু অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর॥
সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর।
অপ্সর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ।
একে একে সবে শিবে দিলা দরশন॥
চারি ভাই সনক সনন্দ সনাতন।
সনৎকুমার দেখা দিলা ততক্ষণ॥
বশিষ্ঠ প্রচেতা ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ।
নারদ অঙ্গিরা অত্রি দক্ষ ক্রতু সহ॥
আইলেন পিতা পুত্র পরাশর ব্যাস।
শুকদেব আইলা যাহে পুরাণ প্রকাশ॥
যম আপস্তম্ব শঙ্খ লিখিত গৌতম।
দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ কপিল কর্দ্দম॥
কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্য অসিত দেবল।
জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ ধেয়ানে অটল॥
দধীচি অগস্ত্য কর্ণ সৌভরি লোমশ।
বিশ্বামিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বাল্মীকি তাপস॥
ভার্গব চ্যবন ঔর্ব্ব হনু শাতাতপ।
উতঙ্ক ভরত ধৌম্য কশ্যপ কাশ্যপ॥
নৈমিষারণ্যের ঋষি শৌনকাদিগণ।
বালখিল্যগণ আইল না হয় গণন॥
জয় শব্দ নমঃ শব্দ শঙ্খ ঘণ্টারব।
বেদগান স্তুতি পাঠ মহামহোৎসব॥
অন্নপূর্ণাপুরী আর মূরতি দেখিয়া।
পরস্পর সকলে কহেন বাখানিয়া॥
তোমার কৃপার কথা শঙ্কর কি কব।
তোমা হৈতে অন্নপূর্ণা দেখি সুখী হব

ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর।
পরমেশী পরম পুরুষ পরাৎপর॥
এত দিন যাঁর মূর্ত্তি না দেখি নয়নে।
এত দিন যাঁর ধ্যান না শুনি শ্রবণে॥
নিগমে আগমে গূঢ় যাঁহার ভজন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন॥
ইহলোকে ভোগ পরলোকে মোক্ষ হয়।
কেবল কৈবল্যরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
হেন মূর্ত্তি প্রকাশ করিলা তুমি শিব।
তোমার মহিমা সীমা কেমনে কহিব॥
ভবদুঃখসাগরে সকলে কৈলা পার।
বিশ্বনাথ বিনা কাবে লাগে বিশ্বভার॥
তন্ত্রে অন্নপূর্ণামন্ত্র তুমি প্রকাশিলা।
মূরতি প্রকাশি তাহা পূরণ করিলা॥
মূর্ত্তি দেখি পরস্পব কহেন সকলে।
নির্ম্মাণসদৃশ ফল হয় ভাগ্যবলে॥
শঙ্কর কহেন সবে কহিলা উত্তম।
এখনো আমার মনে নাহি ঘুচে ভ্রম॥
যদি মোর ভাগ্যে অন্নপূর্ণা দয়া করে।
তবে ত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে॥
করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা।
তাঁব অধিষ্ঠান হয় তবে ত মহিমা॥
এত বলি মহাদেব আরম্ভিলা তপ।
কৈলা পুবশ্চরণ[1] কতেক কত জপ॥
তপস্যায় মহাযোগী বসিলা শঙ্কর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

১। মন্ত্রসিদ্ধির জন্ত যে অনুষ্ঠান করিতে হয়।

শিবের পঞ্চতপ[১]

তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া॥
জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈল বড়।
ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈলা দড়॥
বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে।
করে লয়ে জপমালা মুদ্রিত নয়নে॥
দিগম্বর বিভূতিভূষিত কলেবর।
গলে যোগপট্ট[২] উপবীত বিষধর॥
বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্যা দুষ্কর।
চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি।
অন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শর্ব্বরী॥
আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত।
একাসনে বসিয়া রজনীদিনপাত॥
শ্রাবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর।
একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর॥
ভাদ্র মাসে আট দিকে পরিপূর্ণ বান।
রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান॥
আশ্বিনে অশেষ কষ্ট করেন কঠোর।
ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতি ঘোর॥
কার্ত্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায়।
অনশনে রজনী দিবস কত যায়॥
অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার॥

১। কঠোর তপস্যা। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রমধ্যে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া, বর্ষায় বৃষ্টিতে এবং শীতে সিক্ত বসনে অবস্থান করিয়া এই তপস্যা করিতে হয়। ২। উত্তরীয় বিশেষ।

পৌষ মাসে দারুণ হিমানী পরকাশ।
রাত্রি দিন জলে বসি নিত্য উপবাস ॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।
রাত্র দিন জলে বসি কম্পিত শরীর ॥
ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর।
উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর ॥
চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা।
উর্দ্ধপদে অধোমুখে অনলের সেবা ॥
ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব।
পঞ্চ মুখে বিবিধ বিধানে কৈলা স্তব ॥
অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী অবতীর্ণা হও।
কাশীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপূজা লও ॥
আনন্দকানন কাশী করিয়াছি স্থান।
তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মশান ॥
তুমি মূলপ্রকৃতি সকল বিশ্বমূল।
সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল ॥
তুমি সকলের সার অসার সকল।
যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে।
সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে ॥
সত্ত্বরজস্তমোগুণ প্রসবিয়া তুমি।
সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি ॥
বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানা মূর্ত্তি ধর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর ॥
আনন্দকানন কাশী সানন্দ করিয়া।
বিহার করহ মোরে সদয়া হইয়া ॥
এইরূপ তপস্যায় গেল কত কাল।
শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল ॥

চর্ম্ম মাংস আদি গেল অস্থি মাত্র শেষ।
তথাপি না হয় অন্নদার দয়ালেশ ॥
এইরূপ তপ করে যত সহচর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্রহ্মাদির তপ

শিবের দেখিয়া তপ করিতে অন্নদাজপ
ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী।
একাসনে অনশনে অন্নদার ধ্যান মনে
অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী ॥
গদা চক্র তেয়াগিয়া পাঞ্চজন্য বাজাইয়া
অন্নদা উদ্দেশে পদ্ম দিয়া।
অনশনে যোগ ধরি তপস্যা করেন হরি
রমা বাণী সংহতি করিয়া ॥
সুখমুণ্ডে হানি বাজ তপ করে দেবরাজ
সহস্রলোচনে জল ঝরে।
সঙ্গে লয়ে দেবীগণে অন্নদা ভাবিয়া মনে
ইন্দ্রাণী দারুণ তপ করে ॥
উর্দ্ধে দুই পদ ধরি হেটে[১] অগ্নি দীপ্ত করি
অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ।
একাসনে অনশনে অন্নদা ধেয়ান মনে
সম শীত বরিষা আতপ ॥
ছাড়ি নিজ অধিকার সঙ্গে লয়ে পরিবার
শমন দারুণ তপ করে।
দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি হৈল অবশেষ
বল্মীক জন্মিল কলেবরে ॥

১। নিম্নে।

নৈঋর্ত রাক্ষস রীত কঠোর তপেতে প্রীত
নিজ মুণ্ড দেয় বলিদান।
পুনর্ব্বার মাথা হয় নিজ রক্ত মাংসময়
বলি দিয়া করয়ে ধেয়ান ॥
বরুণ আপন পাশ গলায় বান্ধিয়া ফাঁস
প্রাণ বলিদান দিতে মন।
অন্নদার অনুগ্রহে পরাণ বিয়োগ নহে
অস্থিমধ্যে অশ্বত্থ জীবন ॥
পবন আহার করি নিয়মে পরাণ ধরি
পবন করয়ে ঘোর তপ।
ঊনপঞ্চাশত ভাগে এক ভাবে অনুরাগে
দিবা নিশি অন্নপূর্ণা জপ ॥
কুবের ছাড়িয়া ভোগ আশ্রয় করিয়া যোগ
অহর্নিশ একাসনে ধ্যান।
দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি চর্ম্ম অবশেষ
সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান ॥
শিবের বিশেষ কায় ঈশানের তপস্যায়
ত্রিলোক হইল টলমল।
কপালে অনল জ্বালি শিরোদ্ভূত ঘৃত ঢালি
ধ্যান ধারণায় অঞ্চল ॥
প্রজাপতি রূপভেদে উচ্চারিয়া চারি বেদে
ঊর্দ্ধপতি ঊর্দ্ধমুখে জপে।
দিক দিক ভেদ নাই টলমল সর্ব্বঠাঁই
ঘোর অন্ধকার ঘোর তপে ॥
সহস্রমুখের স্তবে নিজগণ কলরবে
তপস্যা করয়ে নাগরাজ।
গ্রহ তারা রাশিগণ ব্রহ্মঋষি যত জন
বিদ্যাধর কিন্নরসমাজ ॥

যত দেবঋষিগণ সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যজন
রাজঋষি মহর্ষি সকল।
একাসনে অনশনে তপস্যা অনন্যমনে
দেহে তরু জন্মিল সফল॥
সকলের তপস্যায় দয়া হৈল অন্নদায়
অবতীর্ণা হইলা কাশীতে।
সকলেরে দিতে বর প্রতিমায় কৈলা ভর
সুধাদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে॥
সকলে চেতনা পেয়ে চৌদিকে দেখেন চেয়ে
অনুকম্পা হৈল অনুভব।
দূরে গেল হাহাকার জয় শব্দ নমস্কার
ভুবন ভরিল কলরব॥
চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়।
তার সভাসদবর কহে রায় গুণাকর
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয়॥

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান

কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥
কমলপরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।
বসন্তরাজা আনি ছয় রাগিণীরাণী
করিলা রাজধানী অশোকমূলে॥
কুসুমে পুন পুন ভ্রমর গুন গুন
মদন দিল গুণ ধনুক হুলে।
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধুমুদিত মন ভারত ভুলে॥

মধু মাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন।
সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে।
গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝঙ্কারে॥
সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে।
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে॥
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনীকোলে।
সুখে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে॥
ঘরে ঘরে নানা যন্ত্রে বসন্তের গান।
সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান্॥
শুষ্ক তরু শুষ্ক লতা রসেতে মুঞ্জরে।
মঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে॥
তরুকুল প্রফুল্ল কুসুমছলে হাসে।
তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে॥
ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্র মাস।
ধন্য শুক্লপক্ষ যাহে জগত উল্লাস॥
তাহাতে অষ্টমী ধন্যা ধন্যা নাম জয়া।
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাত অভয়া॥
অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে।
প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে॥
মণিবেদীপরে চিন্তামণির প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্মসুনির্ম্মিত অপার মহিমা॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল জিনিয়া প্রভা যার।
দেবী অধিষ্ঠানে হৈল কোটি গুণ তার॥
প্রতিমাপ্রভাবে যত দেবঋষিগণ।
ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন॥
দৃষ্টিসুধাবৃষ্টিতে সকলে জ্ঞান দিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ্ হাসিয়া॥

শুন শুন যত দেবঋষি আদিগণ।
এতেক কঠোর তপ কৈলা কি কারণ॥
কম্পমান কলেবর করি যোড়কর।
সমুখে রহিলা সবে ভয়ে নিরুত্তর॥
করুণা আকর মাতা দয়া হৈল চিতে।
কহিতে লাগিলা দেবী হাসিতে হাসিতে॥
চিরদিন তপস্যায় পাইয়াছ দুখ।
অনশনে সকলের সুখায়েছে মুখ॥
এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও।
শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও॥
এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন।
অন্ন খান সবে সুখে আনন্দসম্পন্ন॥
বাম করে পানপাত্র রতননির্ম্মিত।
কারণ অমৃত পরিপূর্ণ অতুলিত॥
সঘৃত পলান্নে পরিপূর্ণ রত্নহাতা।
ডান করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা॥
কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান।
পরশেন কখন না হয় অনুমান॥
সকলে ভোজনকালে দেখেন এমনি।
আমারে দিচ্ছেন অন্ন অন্নদা জননী॥
পিষ্টকপর্ব্বত পরমান্ন সরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস।
সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া।
সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া॥
আনন্দসাগরে সবে মগন হইয়া।
প্রণতি করিয়া কম বিনতি করিয়া॥

অন্নে পূর্ণ হৈল বিশ্ব বিশেষত কাশী।
করিব তোমার পূজা এই অভিলাষী ॥
পূজিতে তোমার পদ কাহার শকতি।
তবে পূজা করি যদি দেহ অনুমতি ॥
তোমার সামগ্রী দিয়া পূজিব তোমারে।
লাভে হৈতে বর পাব তরিব সংসারে ॥
অঙ্গীকার কৈলা দেবী সহাস অন্তর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবের অন্নদাপূজা

আনন্দে ত্রিনয়ন সহিত দেবগণ
পূজেন নানা আয়োজন।
সুধন্য চৈত্র মাস অষ্টমী সুপ্রকাশ
বিশদ পক্ষ শুভ ক্ষণে ॥
বিরিঞ্চি পুরোহিত বিধান সুবিদিত
পূজক আপনি মহেশ।
আপনি চক্রপাণি যোগান দ্রব্য আনি
নৈবেদ্য অশেষ বিশেষ ॥
সূর্য্যাদি নব গ্রহ আপন গণ সহ
ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল দশ।
কিন্নরগণ গায় অপ্সর নাচে তায়
গন্ধর্ব্ব করে নানা রস ॥
নারদ আদি যত দেবর্ষি শত শত
চৌদিকে করে বেদ গান।
বিবিধ উপাচার অশেষ উপহার
অনেকবিধ বলিদান ॥

অন্নদা জয় জয় সকল দেবে কয়
ভুবন ভরি কোলাহল।
আনন্দে শূলপাণি করিয়া যোড়পাণি
পূজেন চরণকমল॥
দেউলবেদীপর প্রতিমা মনোহর
তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা।
সর্ব্বতোভদ্র নাম মণ্ডল চিত্রধাম
লিখিলা আপনি বিধাতা॥
সম্মুখে হেমঘট আচ্ছাদি চারু পট
পড়িয়া স্বস্তি ঋদ্ধি বিধি।
সঙ্কল্প সমাচরি গন্ধাধিবাস করি
বিধানবিজ্ঞ ভাল বিধি॥
পূজিয়া গজানন ভাস্কর ত্রিলোচন
কেশব কৌষিকী চরণ।
পূজিয়া নব গ্রহ দিক্‌পাল দশ সহ
বিবিধ আবরণগণ[১]॥
চরণ সরসিজ পূজিয়া জপি বীজ
নৈবেদ্য দিয়া নানামত।
মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
বিবিধ উপাচার যত॥
সমাপি হোমক্রিয়া অন্নাদি নিবেদিয়া
মঙ্গল ইতিহাস গানে।
বাজায়ে বাদ্যগণ করিয়া জাগরণ
দক্ষিণা বিবিধ বিধানে॥

১। মূল দেবতার পূজার পর যে-সব দেবতাকে পূজা করা হয়।

পূজার সমাধানে প্রণমি সাবধানে
সকলে পাইলেন বর।
অন্নদা পদতলে বিনয় করি বলে
ভারত রায় গুণাকর॥

অন্নদার বরদান

ভবানী বাণী বল একবার।
ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী
ভবানী ভবের সার॥

দেবগণে দিয়া দেবী মনোনীত বর।
শিবেরে কহেন শিবা শুনহ শঙ্কর॥
এই বারাণসী পুরী করিয়াছ তুমি।
ইহার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥
এই যে প্রতিমা মোর করিলা প্রকাশ।
এই স্থানে সর্ব্বদা আমার হৈল বাস॥
কলিকালে এ পুরী হইবে অদর্শন।
মোর অবলোকন রহিবে সর্ব্বক্ষণ॥
এই চৈত্র মাস হইল মোর ব্রতমাস।
শুক্ল পক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস॥
এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি।
ধন্য সে এ দিনে মোরে যে করে অতিথি॥
অষ্টাহ মঙ্গল যেই শুনে ইতিহাস।
তাহার নিবাসে সদা আমার নিবাস॥
একমনে মোর গীত যে করে মা· না।
আমি পূর্ণ করি তার মনের কামনা॥
চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী পাইয়া।
গাইবে সঙ্গীত মোর সঙ্কল্প করিয়া॥

দ্বিতীয়ায় দেখি নব শশীর উদয়।
আরম্ভ করিবে গীত দিয়া জয় জয়॥
অষ্টমীর রজনীতে গেয়ে জাগরণ।
নবমীতে অষ্টমঙ্গলায় সমাপন॥
অচলা প্রতিমা মোর ঘরে যে রাখিবে।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার অচলা হইবে॥
ধাতুময়ী মোর বারি প্রতিষ্ঠা করিয়া।
যেই জন রাখে ঘরে প্রত্যহ পূজিয়া॥
তার ঘরে সদা হয় আমার বিশ্রাম।
করতলে তার ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
কামনা করিয়া কেহ আমার মঙ্গল।
গাওয়ায় যদ্যপি শুন তার ক্রম ফল॥
আরম্ভিয়া শুক্রবারে বিধি ব্যবস্থায়।
সমাপিবে শুক্রবারে অষ্টমঙ্গলায়॥
পালা কিম্বা জাগরণ যে করে মাননা।
গাইবে যে দিন ইচ্ছা পূরিবে কামনা॥
যেই জন উপাসনা করিবে আমার।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার॥
বর পেয়ে মহানন্দ হইলা মহেশ।
করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ॥
বিদায় হইয়া যত দেবঋষিগণ।
আপন আপন স্থানে করিলা গমন॥
নিজ নিজ ঘরে সবে মহাকুতূহলে।
করিলা অন্নদাপূজা অষ্টাহ মঙ্গলে॥
অন্নে পূর্ণ হইল ভুবন চতুর্দ্দশ।
সকলে করয়ে ভোগ নানামত রস॥
কৃপা কর কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে।
করুণা আকর বিনা কেবা কৃপা করে॥

মহামায়া মহেশমহিলা মহোদরী।
মহিষমর্দ্দিনী মোহরূপা মহেশ্বরী॥
নন্দনন্দনের প্রতি হইয়া সহায়।
নন্দের নন্দিনী হয়ে গেলা মথুরায়॥
কুরুক্ষেত্রে হৈল কুরুপাণ্ডবের রণ।
যাহে অবতরি হরি ভারাবতারণ॥
আর্য্যা বলি তোমারে অর্জ্জুন কৈলা স্তব।
যে কালে সারথি তার হইলা কেশব॥
সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের জননী।
অপার সংসার পারে তুমি নারায়ণী॥
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ব্যাসবর্ণন

ব্যাস নারায়ণ অংশ ঋষিগণ অবতংস
যাঁহা হইতে আঠার পুরাণ।
ভারত পঞ্চম বেদ নানা মত পরিচ্ছেদ
বেদভাগ বেদান্ত বাখান॥
সদা বেদপরায়ণ প্রকাশিলা পারায়ণ
শিষ্যগণ বৈষ্ণবসংহতি।
পিতা যাঁর পরাশর শুকদেব বংশধর
জননী যাঁহার সত্যবতী॥
দাঁড়াইলে জটাভার চরণে লুটায় তাঁর
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতেক আঁটুবাঁটু[১]॥

১। জড়সড়।

কপালে চড়ক কোঁটা[১] গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খচক্ররেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলি মৃগ বাঘথাবা
সারি সারি হরিনাম লেখা॥
তুলসীর কণ্ঠি গলে লম্বি মালা[২] করতলে
হাতে কানে থরে থরে মালা।
কোশাকুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন
তাহে কৃষ্ণসার মৃগছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কপীন পরি
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল[৩] করঙ্গ[৪] পিবারে জল
হাতে আশা[৫] হিঙ্গুলবরণ॥
এই বেশে শিষ্যগণ সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ
পাঁজি পুঁথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত পুরাণ সংহিতা যত
তর্কাতর্কি নানামত কয়ে॥
কে কোথা কি করে দান কে কোথা কি করে ধ্যান
পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।
কে কোথা কি মন্ত্র লয় কোথা কোন যজ্ঞ হয়
আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া॥
জগতের হিতে মন ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কন
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয় দারা আপনার নয়
সেই ধর্ম্ম পরলোক সার॥

১। উজ্জ্বল; ২। বৈষ্ণবের জপমালা; ৩। লাউ;
৪। ভিক্ষাপাত্র; ৫। দণ্ড।

এইরূপে শিষ্য সঙ্গে সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে
চিরজীবী নরাকার লীলা।
একদিন দৈববশে শিষ্য সহ শাস্ত্ররসে
নৈমিষ কাননে উত্তরিলা॥
শৌনকাদি ঋষিগণ পূজা করে ত্রিলোচন
গালবাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া।
গলায় রুদ্রাক্ষমাল অর্দ্ধচন্দ্রে শোভে ভাল
কলেবরে বিভূতি মাখিয়া॥
শিব ভর্গ ত্রিলোচন বৃষধ্বজ পঞ্চানন
চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর।
ভব শর্ব্ব ব্যোমকেশ বিশ্বনাথ প্রমথেশ
দেবদেব ভীম গঙ্গাধর॥
ঈশ্বর ঈশান ঈশ কাশীশ্বর পার্ব্বতীশ
মহাদেব উগ্র শূলধর।
বিরূপাক্ষ দিগম্বর ত্র্যম্বক ভূতেশ হর
রুদ্র পুরহর স্মরহর॥
এইরূপে ঋষি যত শিবের সেবায় রত
দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন।
ভারত পুরাণে কয় ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয়
বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন॥

শিবপূজা নিষেধ

কি কর নর হরি ভজ রে।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে॥
তরিবারে পরিণাম হর জপে হরিনাম
হরি ভজি পূর্ণকাম ক .লজ রে।
ভব ঘোর পারাবার হরিনাম তরী তার
হরিনাম লয়ে পার হৈল গজ রে॥

ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম এ চারি বর্গের ধাম
বেদে বলে হরি নাম সুখে যজ রে।
গুরুবাক্য শিরে ধরি রহিয়াছি সার করি
ভারতের ভূষা হরি-পদরজ রে॥

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন॥
সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই॥[১]
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম।
মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম॥
অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্য জনে।
মোক্ষ ফল পাবে যদি ভজ নারায়ণে॥
নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ প্রকৃতি তাহার॥
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়।
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময়॥
সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়।
যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয়॥
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে।
মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে॥
সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি।
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি॥
সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্ব দেবে হরি॥

১। দেন।

বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে॥
এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে।
কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে॥
নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়।
ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তম বিনা নয়॥
তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে।
অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম জীবে॥
সত্ত্বরজঃ প্রভাব ক্ষণেক বিনা নয়।
তমের প্রভাব দেখ চিরকাল রয়॥
রজোগুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব।
সত্ত্বগুণে পালন বিবিধ উপদ্রব॥
তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম।
বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম॥
রজোগুণে কৌমার যৌবন সত্ত্বগুণে।
তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটিগুণে॥
রজোগুণে বিধি তাঁর নাভিতটে স্থান।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান॥
তমোগুণে শিব তাঁর ললাটে আলয়।
ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয়॥
তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ।
তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান॥
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়।
তোমার এমন কথা এত বড় দায়॥
এই কথা কহ যদি কাশী মাঝে গিয়া।
তবে সবে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া॥
এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে।
বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥

ব্যাসদেব চলিলা লইয়া নিজগণ।
পথে পথে করি হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবনামাবলী

জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশাননাটক বিষাণবাদক
হুতাশভালক মহত্তর ॥
জয় সুরারিনাশন বৃষেশবাহন
ভুজঙ্গভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোকপালক
ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর ॥
জয় রবীন্দুপাবক ত্রিনেত্রধারক
খলান্ধকান্তক হতস্মর।
জয় কৃতাঙ্গকেশব কুবের বান্ধব
ভবাজ ভৈরব পরাৎপর ॥
জয় বিষাক্তকণ্ঠক কৃতান্তবঞ্চক
ত্রিশূলধারক হতাধ্বর।
জয় পিনাকপণ্ডিত পিশাচমণ্ডিত
বিভূতিভূষিত কলেবর ॥
জয় কপালধারক কপালমালক
চিতাভিসারক শুভঙ্কর।
জয় শিবামনোহর সতীসদীশ্বর
গিরীশ শঙ্কর কৃতজ্বর ॥

জয় কুঠারমণ্ডিত কুরঙ্গরঙ্গিত
বরাভয়ান্বিত চতুষ্কর।
জয় সরোরুহাশ্রিত বিধিপ্রতিষ্ঠিত
পুরন্দরার্চ্চিত পুরন্দর॥
জয় হিমালয়ালয় মহামহোময়
বিলোকনোদয়চরাচর।
জয় পুনীহি ভারত মহীশভারত
উমেশ পর্ব্বতসুতাবর॥

ঋষিগণের কাশীযাত্রা

এইরূপে শৌনকাদি যত শৈবগণ।
শিবগুণ গান করি করিলা গমন॥
হাতে কানে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা।
বিভূতিভূষিত অঙ্গ পরি বাঘছালা॥
রক্তচন্দনের অৰ্দ্ধচন্দ্রফোঁটা ভালে।
ববম্ ববম্ বম্ ঘন রব গালে॥
কোশাকুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে।
কমণ্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গাজলে॥
অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পরে উরূপর।
নাভি ঢাকে দাড়ি গোঁপে বিশদ চামর॥
করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম।
চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম॥
ব্যাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে।
উর্দ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ কয়ে॥
একেবারে হরি হরি হর হর রব।
ভাবেতে অধীরা ধরা মানি মহোৎসব॥
বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে।
দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে॥

অভেদে হইল ভেদ এ বড় দুর্ব্বোধ।
কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ॥
ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে।
ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে॥

হরিনামাবলী

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব
কংসদানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন
কুঞ্জকানন রঞ্জন॥
জয় কেশিমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন
গোপিকাগণ মোহন।
জয় গোপবালক বৎসপালক
পূতনাবক নাশন॥
জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ[1]
দেবদুর্ল্লভ বন্দন।
জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক
পদ্মনন্দক মণ্ডন॥
জয় শান্তকালিয় রাধিকাপ্রিয়
নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন।
জয় সত্য চিন্ময় গোকুলালয়
দ্রৌপদীভয় ভঞ্জন॥
জয় দৈবকীসুত মাধবাচ্যুত
শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয় সজ্জনোদয়
ভারতাশ্রয় জীবন॥

১। সাধুব্যক্তির লভ্য।

ব্যাসের বারাণসী প্রবেশ

এইরূপে ব্যাস গিয়া বারাণসী প্রবেশিয়া
আদিকেশবেরে প্রণমিয়া।
সংহতি বৈষ্ণবগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
নানা রসে নাচিয়া গাইয়া॥
কীর্ত্তনিয়াগণ সঙ্গে গান করে নানা রঙ্গে
বাল্য গোষ্ঠ দান বেশ রাস।
পূর্ব্ববঙ্গ রসোদ্গার মাথুর বিরহ আর
হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ॥
বাজে খোল করতাল কেহ বলে ভাল ভাল
কেহ কাঁদে ভাবে গদগদ।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে
নানামতে গান বিষ্ণুপদ॥
কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ
কেহ তারে ধরে দেয় কোল।
ঊর্দ্ধভুজে ঊর্দ্ধপদে কেহ নাচে প্রেমমদে
কেহ বলে হরি হরি বোল॥
গোপকুলে অবতরি যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি
আদি অন্ত মধ্যে সে সকল।
একমনে ব্যাস কন শুনেন ভকতগণ
আনন্দে লোচনে ঝরে জল॥
গোলোকেতে গোপীনাথ রাধা আদি গোপী সাথ
শ্রীদামাদি সহচরগণ।
নন্দ যশোদাদি যত সব নিত্য অনুগত
কপিলাদি যতেক গোধন॥

সুধাসমুদ্রের মাঝে চিন্তামণি বেদী সাজে
কল্পতরু কদম্বকানন।
নানা পুষ্প বিকসিত নানা পক্ষী সুশোভিত
সদানন্দময় বৃন্দাবন ॥
কাম সদা মূর্ত্তিমান ছয় ঋতু অধিষ্ঠান
রাগিণী ছত্রিশ আর যত।
ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে সদা রাসরসরঙ্গে
নৃত্য গীত বাদ্য নানামত ॥
গোলোক সম্পদ লয়ে ভকতে সদয় হয়ে
অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে।
কংস আদি দুষ্টগণ করিবারে নিপাতন
দৈবকীজঠরে জন্ম ছলে ॥
বসুদেব কংসভয় নন্দের মন্দিরে লয়
খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন।
পূতনা বধিতে চলে বিষস্তনপান ছলে
কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন ॥
শকট ভাঙ্গিয়া রঙ্গি যমল অর্জ্জুন ভঙ্গি
তৃণাবর্ত্তে নিধন করিলা।
মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে যশোদারে কুতূহলে
বিশ্বরূপ মুখে দেখাইলা ॥
ননী চুরি কৈলা হরি যশোদা আনিল ধরি
উদূখলে লইলা বন্ধন।
গোচারণে বনে গিয়া বকাসুরে বিনাশিয়া
অঘ অরিষ্টের বিনাশন ॥
বধ কৈলা বৎসাসুর কেশীরে করিলা চূর
বল হাতে প্রলম্ব বধিলা।
ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করি গোবর্দ্ধন গিরি ধরি
বৃষ্টিজলে গোকুল রাখিলা ॥

ব্রজ পোড়ে দাবানলে পান করিলেন ছলে
করিলেন কালিয়দমন।
সহচর পাঠাইয়া যজ্ঞ অন্ন আনাইয়া
করিলেন কাননে ভোজন॥
বিধাতা মন্ত্রণা করি শিশু বৎসগণ হরি
রাখিলেন পর্ব্বতগুহায়।
নিজ দেহ হৈতে হরি শিশু বৎসগণ করি
বিধাতারে মোহিলা মায়ায়॥
গোপের কুমারী যত করে কাত্যায়নীব্রত
হরি লৈলা বসন হরিয়া।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে মধুর মুরলী গেয়ে
রাসক্রীড়া গোপিনী লইয়া॥
করিতে আপন ধ্বংস অক্রূরে পাঠায়ে কংস
হরি লয়ে গেল মথুরায়।
ধোপা বধি বস্ত্র পরি কুব্জারে সুন্দরী করি
সুশোভিত মালীর মালায়॥
দ্বারে হস্তী বিনাশিয়া চাণূরাদি নিপাতিয়া
কংসাসুরে করিলা নিধন।
বসুদেব দৈবকীরে নতি কৈলা নতশিরে
দূর করি নিগড়বন্ধন॥
উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া পড়িলা অবন্তী গিয়া
দ্বারকাবিহার নানামতে।
অপার এ পারাবার কতেক কহিব তার
বিখ্যাত ভারত ভাগবতে॥

ব্যাসের শিবনিন্দা

হরি হরে করে ভেদ। নর বুঝে না রে।
অভেদ কহে চারি বেদ॥
অভেদ ভাবে যেই পরম জ্ঞানী সেই
তারে না লাগে পাপক্লেদ।
যে দেহে হরি হরে অভেদরূপে চরে
সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ॥
একই কলেবর হইলা হরি হর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুইরূপে সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ॥

এইরূপে বেদব্যাস কয়ে হরিগুণ।
ঊর্দ্ধভুজে কহেন সকল লোক শুন॥
সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্ববেদে হরি॥
হর আদি আর যত ভোগের গোসাঁই।
মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই॥
এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে।
শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে॥
ক্রোধদৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল।
ভুজস্তম্ভ[১] কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহিলেন ব্যাস।
শৈবগণে কত মত করে উপহাস॥
চারি দিকে শিষ্যগণ কাঁদিয়া বেড়ায়।
কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায়॥

১। বাহুর স্তব্ধতা বা নিশ্চলতা।

গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িলা সঙ্কটে।
কুণ্ঠভাবে উত্তরিলা ব্যাসের নিকটে ॥
বিস্তর ভর্ৎসিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা।
আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা ॥
যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব ॥
শিবের প্রভাববলে আমি চক্রধারী।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী ॥
শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবেরে যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট ॥
মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয় ॥
যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে।
শিবস্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে ॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে।
কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফুরে ॥
গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলি ছুঁইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া ॥
শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর।
যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর ॥
এই স্তব যে জন পড়িবে একমনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে সেই জনে ॥
এত শুনি বেদব্যাস পরম উল্লাস।
তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস ॥
মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দির তিলকে।
অর্দ্ধচন্দ্রফোঁটা কৈলা কপালফলকে ॥

ছিঁড়িয়া তুলসীকণ্ঠী লম্বিমালা যত।
পরিলা রুদ্রাক্ষমালা শৈব অনুগত ॥
ফেলিয়া তুলসীপত্র বিল্বপত্র লয়ে।
ছাড়িয়া হরির গুণ হরগুণ কয়ে ॥
ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হৌক পরিণাম
অত্যাবধি আর না লইব হরিনাম ॥
এইরূপে ব্যাসদেব কাশীতে রহিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা ॥

ব্যাসের ভিক্ষাবারণ

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর।
বিভূতিভূষিত কলেবর ॥
তরঙ্গভঙ্গিত ভুজঙ্গরঙ্গিত
কপর্দ্দমর্দ্দিত জটাধর।
কুবের বান্ধব বিভূতিবৈভব
ভবেশ ভৈরব দিগম্বর ॥
ভুজঙ্গকুণ্ডল পিশাচমণ্ডল
মহাকুতূহল মহেশ্বর।
রজঃপ্রভায়ত পদাম্বুজানত
সুদীন ভারত শুভঙ্কর ॥

এইরূপে বেদব্যাস রহিলা কাশীতে।
নন্দীরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে ॥
দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব ॥
যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল ॥

কি দোষে মুছিল হরিমন্দির ফোঁটায়।
কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসীমালায়॥
হের দেখ তুলসীপত্রের গড়াগড়ি।
বিল্বপত্র লইয়া দেখহ রড়ারড়ি[১]॥
হেব দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম।
রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম॥
মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি ত তাহাব পূজা গ্রহণ না কবি॥
হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীব॥
রুদ্রাক্ষ তুলসীমালা যেই ধরে গলে।
তার গলে হরিহরে থাকি কুতূহলে॥
অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস।
উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস॥
চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা।
কাশীতে ব্যাসের অন্ন শিব কৈলা মানা॥
স্নান পূজা সমাপিয়া ব্যাস ঋষিবর।
ভিক্ষাহেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর॥
ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত।
কিঞ্চিত না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত॥
ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন।
গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন॥
বালক কুক্কুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি[২]।
ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী॥

১। দৌড়াদৌড়ি। ২। তাড়ানো।

ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন।
ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন ॥
শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়।
হাত হৈতে হরিয়া ভৈরব লয়ে যায় ॥
রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত।
মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত ॥
এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী।
ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি ॥
সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া।
অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া ॥
কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও।
কেহ বলে আপনাব নামটি লুকাও ॥
এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল।
ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল ॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া।
শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া ॥
আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস।
শিষ্য সহ সে দিন করিলা উপবাস ॥
পরদিন ভিক্ষাহেতু শিষ্য পাঠাইলা।
ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা ॥
মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা।
কাশীখণ্ডে[১] বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা ॥
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

১। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ড অধ্যায়ে ব্যাসের শিববিদ্বেষের কাহিনী আছে। তবে তাহাতে ব্যাসকাশীর উল্লেখ নাই।

কাশীতে শাপ

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়া কর হে॥

তুমি দীনদয়াময় আমি দীন অতিশয়
তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে।
তব পদে আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে॥
পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে।
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে
ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে॥

ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী।
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী॥
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী॥
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে।
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে॥
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে।
যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে॥
শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায়।
ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায়॥
ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া।
আশ্রমে চলিলা ভিক্ষাপাত্র ফেলাইয়া॥
হেনকালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা।
ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা॥

জগতজননী মাতা সবারে সমান।
শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান ॥
আকাশ পবন জল অনল অবনী।
সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি ॥
সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা।
তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সারা ॥
মেঘে করে যেমন সকলে জলদান।
তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান ॥
তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া।
তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া ॥
হরি হর প্রভৃতিরো শত্রু মিত্র আছে।
শত্রু মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে ॥
চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া।
আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া ॥
হেন কালে পথে আসি কহেন মহেশ।
কোথায় চলেছ থুয়ে কার্ত্তিক গণেশ ॥
ক্রোধভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক।
ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসি থাক ॥
একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী[১] ধুতুরায় ভোল।
অল্প অপরাধে কর মহাগণ্ডগোল ॥
তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস।
ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস ॥
একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে।
অদ্যাপি সে পাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে ॥
কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে।
সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে ॥

১। সিদ্ধিখোর।

এখনো যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়।
আর বার দিবে শাপ পেটের জ্বালায়॥
আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া।
আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া॥
এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধভরে যান।
সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান॥
সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া॥
বুড়াটির ঠাট হেদে দেখ লো বিজয়া॥
ভারত কহিছে ইথে সাক্ষী কেন মান।
তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান॥

অন্নদার মোহিনী রূপ

এ কি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা।
চরণে অরুণরঙ্গিমা॥
হইতে সোঁসর শম্ভু হৈলা হর
দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা।
থাকিতে অধরে সুধা সাধ করে
সুধাকরে ধরে কালিমা॥
ফুলধনুতনু লাজে তেজে ধনু
দেখি ভুরু ধনু বক্রিমা।
রূপ অনুভবে মোহ হয় ভবে
ভারত কি কবে মহিমা॥

মায়া করি জয়া বিজয়ারে লুকাইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥
কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥

ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥
উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদিস্থলে।
ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে।
পদনখে রহিয়াছে দশগুণ হয়ে॥
মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া।
হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া॥
বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী।
ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী॥
চক্ষে যিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু।
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥
রতন কাঁচুলি শাড়ী বিজুলী চমকে।
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে।
কঙ্কণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥
নিরুপম সে রূপ কিরূপ কব আমি।
যে রূপ দেখিয়া কামরিপু হন কামী॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া॥
মায়াময় একখানি পুরী নির্ম্মাইয়া।
অতিবৃদ্ধ করি হয়ে তাহাতে রাখিয়া॥

আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরমসুন্দরী।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি॥
শুন ব্যাস গোসাঁই আমার নিবেদন।
নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন॥
বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথিভক্তিমান।
অতিথিসেবন বিনা জল নাহি খান॥
তপস্বী তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর।
ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর॥
শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল।
কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল॥
অন্ন বিনা তিন দিন মোরা উপবাসী।
কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিলা আসি॥
নিরুপমরূপা তুমি নিরুপমবয়া।
নিরুপমগুণা তুমি নিরুপমদয়া॥
তখনি পাইনু ভিক্ষা কহিলা যখনি।
পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি॥
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
দেখিয়াছি এ সকলে সে সকলে জানি।
ততোধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি॥
শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী।
সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি॥
প্রতি ঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই।
অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই॥
এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য অন্তরে।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদুমধুস্বরে॥
কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি।
শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী॥

এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া।
অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পূরিয়া॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত।
ভোজন করিলা সবে বাসনার মত॥
ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা।
হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিলা॥
বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে।
হেন কালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে॥
ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও।
বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও॥

শিবব্যাসে কথোপকথন

নগনন্দিনি সুরবন্দিনি
রিপুনিন্দিনি গো।
জয়কারিণি ভয়হারিণি
ভবতারিণি গো॥
জটজালিনি শরমালিনি
শশিভালিনি সুখশালিনি
করবালিনি গো।
শিবগেহিনি শিবদেহিনি
শিবরোহিণি শিবমোহিনি
শিবসোহিনি গো॥
গণতোষিণি ঘনঘোষিণি
হঠদোষিণি শঠরোষিণি
গৃহপোষিণি গো।
মৃদুহাসিনি মধুভাষিণি
খলনাশিনি গিরিবাসিনি
ভারতাশিনি গো॥

বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমি ত পণ্ডিত।
কিঞ্চিত জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥
তপস্বী কাহারে বল কিবা ধর্ম্ম তার।
কি কর্ম্ম করিলে পায় পরলোকে পার॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ভেদ প্রধান সন্ন্যাস॥
সর্ব্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্যমূল্য॥
ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥
শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ হইয়া।
আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া॥
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন॥
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি যত তপঃ ক্রিয়া।
জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া॥
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়।
সেই রূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয়॥
ঊর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জর জর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥
গর গর গর্জ্জে ফণী জিহি[১] লক লক।
অর্দ্ধ শশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক ধক॥
হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীম নাদে কাঁপে ত্রিভুবন॥

১। জিহ্বা।

মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক।
শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক॥
বধিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে।
ভর্ৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জনে-গর্জ্জনে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
অভেদ যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ।
কি মর্ম্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ॥
সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে।
আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে॥
মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ।
কোন্ দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ॥
কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ।
কেন শাপ দিলি, অরে বিটলা বামন॥
এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও।
এই ক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও॥
অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর।
পুন যেন আসিতে না পায় কাশীপুর॥
ব্যাসদেব রুদ্ররূপী দেখি মহেশ্বরে।
ভয়ে কম্পমান তনু কাঁপে থর থরে॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে।
চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে॥
অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।
বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ॥
জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥
জগৎপিতা মহাদেব তুমি জগন্মাতা।
হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা॥

শিবের হইল তমোগুণের উদয়।
যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয় ॥
পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম।
বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম ॥
পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল।
সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল ॥
শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে।
এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে ॥
শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে।
শঙ্করি করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে ॥
তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্ব্বদা।
কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা ॥
ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা।
শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাস বর দিলা ॥
অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা।
কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা ॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥
এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী হৈতে যান ॥
ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়।
লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায় ॥
বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি[১]।
শিষ্য সহ ব্যাসদেব গেলা কাশী ছাড়ি ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

১। তাড়ানো।

ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণোদ্যোগ

কাশীতে না পেয়ে বাস মনোতুঃখে বেদব্যাস
বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
তুচ্ছ লোক আছে যারা কাশীতে রহিল তারা
আমার না হৈল কাশীবাস ॥
এ বড় রহিল শোক কলঙ্ক ঘুষিবে লোক
ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর।
নাম ডাক ছিল যত সকলি হইল হত
ভাঙ্গড় করিল দর্প চুর।
তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাল তার
কোনখানে সমাদর নাই।
সবে করে উপহাস ইনি সেই বেদব্যাস
কাশীতে না হৈল যার ঠাঁই ॥
যদি করি বিষপান তথাপি না যাবে প্রাণ
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়
চিরজীবী করিলা গোসাঁই ॥
ভবিতব্য ছিল যাহা অদৃষ্টে করিল তাহা
কি হবে ভাবিলে আর বসি।
তবে আমি বেদব্যাস এইখানে পরকাশ
করিব দ্বিতীয় বারাণসী ॥
করিয়াছি যত তপ করিয়াছি যত জপ
সকলি করিনু ইথে পণ।
নিজ নাম জাগাইব এইখানে প্রকাশিব
কাঁশীর যে কিছু আয়োজন ॥
কাশীতে মরিলে জীব রামনাম দিয়া শিব
কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে।

এখানে মরিবে যেই সদ্যমুক্ত হবে সেই
না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে ॥
অসাধ্য সাধন যত তপস্যায় হয় কত
তপোবলে রাত্রি হয় দিবা।
বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া তপস্যায় ভর দিয়া
বিশ্বামিত্র না করিল কিবা ॥
মোরে খেদাইল শিব তার সেবা না করিব
বর না মাগিব তার ঠাঁই।
বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দী করেছিল খুন
কিঞ্চিত যোগ্যতা তার নাই ॥
বিধাতা সবার বড় তাঁহারে করিব দড়
যাঁহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।
তিনি পিতামহ হন সন্তানে বিমুখ নন
অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি ॥
তাঁরে তুষি তপস্যায় বব মাগি তাঁর পায়
সকল পাইব এথা বসি।
পুরী করি মোক্ষধাম জাগাইব নিজ নাম
নাম থুব ব্যাসবারাণসী ॥
গঙ্গা মহাতীর্থ জানি গঙ্গারে এখানে আনি
আগে ত গঙ্গার কাছে যাই।
গঙ্গা সে শিবের পুঁজি মোক্ষ-কপাটের কুঁজি[১]
গঙ্গারে অবশ্য আনা চাই ॥
গঙ্গা গঙ্গা মোক্ষধাম জানিত কে তার নাম
আমা হৈতে তাহার প্রকাশ।
আমি যদি ডাকি তারে অ-শ্য আসিতে পারে
ইথে কিছু নাহি অবিশ্বাস ॥

১। চাবি ঃ

এত করি অনুমান গঙ্গারে আনিতে যান
বেদব্যাস মহাবেগবান্।
গঙ্গার নিকটে গিয়া ধ্যান কৈলা দাঁড়াইয়া
গঙ্গা আসি কৈলা অধিষ্ঠান ॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি
রচিবারে অন্নদামঙ্গল।
ভারত সরস ভণে শুন সবে একমনে
ব্যাসদেব গঙ্গার কন্দল ॥

গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা

ব্যাস কন গঙ্গে চল মোর সঙ্গে
আমি এই অভিলাষী।
কাশী মাঝে ঠাঁই শিব দিল নাই
করিব দ্বিতীয় কাশী ॥
তমোগুণী শিব তারে কি বলিব
মত্ত ভাঙ্গ ধুতুবায়।
ডাকিনী বিহারী সদা কদাচারী
পাপ সাপগুলা গায় ॥
শ্মশানে বেড়ায় ছাই মাখে গায়
গলে মুণ্ডঅস্থিমালা
বলদ বাহন সঙ্গে ভূতগণ
পরে ব্যাঘ্র হস্তি ছালা ॥
যত অমঙ্গল সকল মঙ্গল
তাহারে বেড়িয়া ফিরে।
কেবল আপনি পতিতপাবনী
তুমি আছ তেঁই শিরে ॥

জটায় তাহার তব অবতার
তাই সে সকলে মানে।
তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা
অন্য জন কিবা জানে॥
যত অমঙ্গল শিবে সে সকল
মঙ্গল তোমার প্রেম।
নানা দোষময় লোহা যেন হয়
পরশ পরশি হেম॥
যে কারণ নীর ব্রহ্মাণ্ড বাহির
যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে।
বিধি হরি হর আদি চরাচর
কত হয় কত নাশে॥
সে কারণ নীর তোমার শরীর
তুমি ব্রহ্ম সনাতন।
সৃজন পালন নাশের কারণ
তোমা বিনা কোন জন॥
যেই নিরঞ্জন চিৎরূপী হন
জনার্দ্দন যারে কয়।
দ্রবরূপে সেই গঙ্গা তুমি এই
ইহাতে নাহি সংশয়॥
তোমা দরশনে মোক্ষ সেই ক্ষণে
না জানি স্নানের ফল।
প্রায়শ্চিত্তভয় সেখানে কি হয়
যেখানে তোমার জল॥
তুমি নারায়ণী পতিতপাবনী
কামনা পূরাও মোর।
মোর সঙ্গে আসি প্রকাশহ কাশী
তারহ সঙ্কট ঘোর।

যে মরে কাশীতে তারে মোক্ষ দিতে
রামনাম দেন শিব।
আর কত দায় ভোগ হয় তায়
তবে মোক্ষ পায় জীব ॥
কাশীতে আমার কৃপায় তোমার
এমনি হইতে চাহে।
যে মরে যখনি নির্ব্বাণ তখনি
বিচার না রবে তাহে ॥
ব্যাসের এমন শুনিয়া বচন
গঙ্গার হইল হাসি।
ভারত কহিছে মোরে না সহিছে
তুমি কি করিবে কাশী ॥

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি

কহিছেন গঙ্গা শুন হে ব্যাস।
কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস ॥
কে তুমি কি শক্তি আছে তোমার।
শিব বিনা কাশী কে করে আর ॥
কণ্ঠে কালকূট যেই ধরিল।
লীলায় অন্ধক সেই বধিল ॥
কটাক্ষে কামেরে নাশিল যেই।
কামিনী লইয়া বিহরে সেই ॥
সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার।
ভবনাম ভব করিতে পার ॥
যাঁহার জটায় পাইয়া ধাম।
গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম ॥
কারণজল মোরে বল যেই।
কারণজলের কারণ সেই ॥

না ছিল সৃষ্টির আদি যখন।
কাশীপতি কাশী কৈলা তখন॥
থুইলা আপন শূলের আগে।
পৃথিবীর দোষ গুণ না লাগে॥
করিবেন যবে প্রলয় হর।
রাখিবেন কাশী শূলউপর॥
তবে যে দেখহ ভূমিতে কাশী।
পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসি॥
জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত্।
জলনাশে নহে তার নিপাত॥
তবে যে কহিলা তারক নামে।
মোক্ষ দেন শিব কাশীর ধামে॥
তুমি কি বুঝিবা তার চলনি।
আপনার নাম দেন আপনি॥
আমার বচন শুন হে ব্যাস।
কদাচ না কর হেন প্রয়াস॥
শিবনিন্দা কর এ দায় বড়।
শিবপদে মন করহ দড়[1]॥
শিবনিন্দা তুমি কর কেমনে।
দক্ষযজ্ঞ বুঝি না পড়ে মনে॥
পুন না নিন্দিহ আমার কাছে।
যে শুনে তাহার পাতক আছে॥
জানেন সকল শঙ্কর স্বামী।
এ সব কথায় না থাকি আমি॥
শুনিয়া ব্যাসের হইল রোষ।
ভারত কহিছে এ বড় দোষ॥

[1] দৃঢ়।

ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার

ব্যাসের হইল ক্রোধ তেয়াগিয়া উপরোধ
গঙ্গারে কহেন কটুভাষে।
কালের উচিত কর্ম্ম বুঝিনু তোমার মর্ম্ম
তুমি মোরে হাস উপহাসে॥
তোমে অন্তরঙ্গ জানি করিনু যুগলপাণি
উপকারে আসিতে আমার।
তাহা হৈল বিপরীত আর কহ অনুচিত
দৈবে করে কি দোষ তোমার॥
আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে বাড়াইনু
সেই মোরে তুচ্ছ করি কহে।
মাতঙ্গ পড়িলে দরে[১] পতঙ্গ প্রহার করে
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে॥
উচিত কহিব যদি নদীমধ্যে তুমি নদী
পুণ্যতীর্থ বলি কে জানিত।
পুরাণে বর্ণিনু সেই পুণ্যতীর্থ হলে তেঁই
নৈলে তোমা কে কোথা মানিত॥
জহ্নু মুনি করে ধরি পিলেক গণ্ডূষ করি
কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম।
সে দোষ থুইয়া দূরে জানাইনু তিন পুরে
জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম॥
শান্তনু রাজারে লয়ে ছিলি তার নারী হয়ে
তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা।
শান্তনুরে করি সারা হয়েছ শিবের দারা
তোর,সমা পুণ্যবতী কেটা॥

১। দহে; হ্রদে।

পেয়েছ শিবের জটা তাহাতে সাপের ঘটা
কপালে বহ্নির তাপ লাগে।
চণ্ডী করে গণ্ডগোল ভূতভৈরবের রোল
কোন্ সুখে আছ কোন্ রাগে ॥
স্বভাবতঃ নীচগতি সতত চঞ্চলমতি
কভু নাহি পতির নিয়ম।
যে ভাল ভজিতে পারে পতি ভাব কর তারে
সিন্ধু সঙ্গে সম্প্রতি সঙ্গম ॥
বেশ্যাধর্ম্ম লয়ে আছ জাতি কুল নাহি বাছ
রূপ গুণ যৌবন না চাও।
মা বলিয়া সেবা দেই ক্ষীর পান করে যেই
পতি কর কোলে মাত্র পাও ॥
আপনার পক্ষ জানি কহিলাম তোরে আনি
তুমি তাহে বিপরীত কহ।
তুমি মোর কি করিবা তোমার শকতি কিবা
বিষ্ণুপাদোদক বিনা নহ ॥
শাপ দিয়া করি ছাই অথবা গণ্ডূষে খাই
ব্রাহ্মণেরে তোর অল্প জ্ঞান।
সিন্ধু তোর পতি যেই ব্রহ্মতেজ জানে সেই
অগস্ত্য করিয়াছিল পান ॥
ব্যাসদেব এইরূপে মজিয়া কোপের কূপে
গঙ্গার করিলা অপমান ॥
ভারত সভয়ে কহে মোরে যেন দয়া রহে
স্তুতি নিন্দা গঙ্গার সমান ॥

গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে।
ব্যাসেরে ভৎসিয়া কন মহাক্রোধ মনে ॥
শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর কহিলা।
এই অহঙ্কারে কাশীবাস না পাইলা ॥
নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা।
শিবনিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা ॥
তোর প্রকাশিতা আমি কেমনে কহিলি।
বেদমত পুরাণেতে আমারে বর্ণিলি ॥
যতেক প্রসঙ্গ লয়ে করেছ পুরাণ।
আমার প্রসঙ্গ আছে তেঁই সে প্রমাণ ॥
তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তনুর নারী।
সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈনু তারি ॥
সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা।
শিবঅংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা ॥
প্রকৃতি পুরুষ মোরা তুই কি জানিবি।
আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি ॥
আমার জাতি দায় কে ধরিবে[১] তোরে।
কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে ॥
বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ।
রচিয়াছ আপনি পরমজ্ঞানবান ॥
তাহে কহিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম্ম।
ভাবিয়া দেখহ দেখি তাহার কি মর্ম্ম ॥
পরাশর ব্রহ্মঋষি তোর পিতা যেই।
ব্রাহ্মণের লক্ষণে ব্রাহ্মণ বটে সেই ॥

১। দোষ দিবে।

মৎস্যগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণী ত নহে।
তার গর্ভে জন্ম তোর ব্রাহ্মণ কে কহে ॥
পরাশর অপসর[1] তোর জন্ম দিয়া।
শান্তনু তোমার মায়ে পুন কৈল বিয়া ॥
বৈপিত্র[2] দু ভাই তাহে জন্মিল তোমার।
একটি বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ আর ॥
অম্বালিকা অম্বিকা বিবাহ কৈল তারা।
যৌবনে মরিল দুটি বউ রৈল সাবা ॥
পুত্র হেতু সত্যবতী তোমার জননী।
তোমাবে দিলেন আজ্ঞা যেমন আপনি ॥
তুমি রণ্ডা[3] ভ্রাতৃবধূ কবিয়া গমন।
জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই জন ॥
কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈল বিয়া।
সম্ভোগে রহিত হৈল শাপের লাগিয়া ॥
ভেবে মরে কুন্তী মাদ্রী করিব কেমন।
তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন ॥
ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র আর অশ্বিনীকুমার।
উপপতি হৈতে পাঁচ পুত্র হৈল তার ॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জ্জুন নকুল।
সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডব অতুল ॥
তুমি তাহে আপনার মত বিধি দিয়া।
পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলা বিয়া ॥
জন্ম কর্ম্ম কথা সব সমান তোমার।
তুমি কলঙ্কের ডালি কলঙ্ক আমার ॥
ব্রহ্মশাপ কি দিবি কি তোবে মোর ভয়।
ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয় ॥

১। অবসর। ২। একই মাতার গর্ভে বিভিন্ন পিতার ঔরসজাত সন্তান।
৩। রাঁড়; রাঁড়ী: বিধবা।

ব্রহ্মশাপ কিবা দিবি কে তোরে ডরায়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ মোর নামে যায়॥
তুই কি জানিবি ব্রহ্মা তোর পিতামহ।
সে জানে মহিমা মোর তারে গিয়া কহ॥
এত বলি ক্রোধে গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান।
গালি খেয়ে ব্যাসদেব হৈলা হতজ্ঞান॥
ভারত কহিছে ব্যাস ধিরি ধিরি ধিরি।
গিয়াছিলা যথা হৈতে তথা গেলা ফিরি॥
দীনদয়াময়ী দেবী দয়া কর দীনে।
দারিদ্র্য দুর্গতি দূর কর দিনে দিনে॥
ধর্ম্ম তার ধরা তার ধন তার ধান।
ধ্যানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান॥
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা

আসনে বসিয়া উন্মনা হইয়া
ভাবেন ব্যাস গোসাঁই।
এই বড় শোক হাসিবেক লোক
মোর কাশী হৈল নাই॥
বিশ্বকর্ম্মা আছে তারে আনি কাছে
সে দিবে পুরী গড়িয়া।
মোক্ষের উপায় শেষে করা যায়
ব্রহ্মার বর লইয়া॥

করি আচমন যোগে দিয়া মন
বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
জানিয়া অন্তরে বিশাই সত্বরে
আসি কৈলা অধিষ্ঠান ॥
বিশাই দেখিয়া সানন্দ হইয়া
বিনয়ে কহেন ব্যাস।
তুমি বিশ্বকর্ম্মা জান বিশ্বমর্ম্ম
তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ ॥
তুমি বিশ্ব গড় তুমি বিশ্বে বড়
তেঁই বিশ্বকর্ম্মা নাম।
তোমার মহিমা কেবা জানে সীমা
কেবা জানে গুণগ্রাম ॥
বিধাতা হইয়া বিশ্ব নিরমিয়া
পালহ হইয়া হরি।
শেষে হয়ে হর তুমি লয় কর
তুমি ব্রহ্ম অবতরি ॥
আমারে কাশীতে না দিলে রহিতে
ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে আমি এইখানে
করিব দ্বিতীয় কাশী ॥
ঠেকিয়াছি দায় চাহিয়া আমায়
নির্ম্মাহ পুরী সুসার।[১]
মোক্ষের নিদান করিতে বিধান
সে ভার আছে আমার ॥
এ সঙ্কট ঘোরে তার যদি মোরে
তবে ত তোমারি হ৲।
ত্রিদেবে ছাড়িয়া ব্রহ্মপদ দিয়া
তোমারে পুরাণে কব ॥

১। সুদৃশ্য।

বিশাই শুনিয়া কহিছে হাসিয়া
তুমি নাহি পার কিবা।
ব্যাসবারাণসী গড়ি দেখ বসি
আমারে ব্রহ্ম করিবা॥
যে হয় পশ্চাৎ দেখিবে সাক্ষাৎ
মোরে পুরীভার লাগে।
কাশীর ঈশ্বর খ্যাত বিশ্বেশ্বর
তাঁর পুরী গড়ি আগে॥
বিশ্বেশ্বর নাম সর্ব্বশুভধাম
বিশাই যেই কহিল।
দৈব রুষ্ট যার বুদ্ধি নাশে তার
ব্যাসের ক্রোধ হইল॥
অরে রে বিশাই তুই ত বালাই
কে বলে আনিতে তায়।
এ বড় প্রমাদ যার সঙ্গে বাদ
তাহারে আনিতে চায়॥
সভয় অন্তর নহ স্বতন্তর
ভয়েতে সবারে মান।
নানা গুণ জানি যারে তারে মানি
বেগার খাটিতে জান॥
তপোবলে কাশী দেখ পরকাশি
দূর হ রে দুরাচার।
তোর গুণধর যত কারিকর
হইবে দুঃখী বেগার॥
বিশাই শুনিয়া কহিছে হাসিয়া
বড় ভ্রান্ত তুমি ব্যাস।
শিবেরে লঙ্ঘিবা কাশী প্রকাশিবা
কেন কর হেন আশ॥

নাহি জান তত্ত্ব নাহি বুঝ সত্ত্ব
শিব ব্রহ্ম সনাতন।
অজাত অমর অনন্ত অজর
আদ্য বিভু নিরঞ্জন॥
কার্য্য সাধিবারে এই যে আমারে
এখনি ব্রহ্ম কহিলে।
ব্রহ্ম বলিবার কি দেখ আমার
কেমনে ব্রহ্ম বলিলে॥
যাহারে যখন দেখহ দুর্জ্জন
তাহারে ব্রহ্ম বলহ।
এইরূপে কত কয়ে নানা মত
লিখিলা যত কলহ॥
বিশাই ধীমান গেলা নিজ স্থান
ব্যাসের হইল দায়।
কহিছে ভারত এ নহে ভারত
করিবে কথামথায়।

ব্যাস ব্রহ্মার কথোপকথন

হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্।
জয় করুণাময় নাশয় তাপম্॥
রঙ্গতরঙ্গিত গাঙ্গ জটাচয়
অর্পয় সর্পকলাপম্।
মহিষবিষাণরবেণ নিবারয়
মম রিপুশমনলুলাপম্॥
কনক কুসুম পরিশোভিত কর্ণে
কর্ণয় ভক্ত কপালম্।
নিগদতি ভারতচন্দ্র উমাধব
দেহি পদং দুরবাপম্॥

ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন।
অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন ॥
আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া।
বিস্তর কহিলা ব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া।
কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া ॥
অরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল।
শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল ॥
কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে।
তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে ॥
শিবনাম জপ কর যেথা সেথা বসি।
যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী ॥
তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া তাঁহারে।
কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে ॥
শিব লঙ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা।
আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা ॥
আমার আছিল বাছা পাঁচটি বদন।
এক মাথা কাটিয়া লইলা পঞ্চানন ॥
কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় যাঁর ॥
কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে।
বুঝিতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে ॥
ভালে যাঁর সুধাকর গলায় গরল।
কপালে অনল যাঁর শিরে গঙ্গাজল ॥
সম যাঁর সুধা বিষে হুতাশন জল।
অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল ॥
তাঁর সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই।
জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোঁসাই ॥

এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজস্থানে।
ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে ॥
যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন ॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার।
কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া যাঁর ॥
যাঁর অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা।
বিধি হরি হর যাঁর নাহি জানে সীমা ॥
শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিলা।
শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা ॥
তদবধি জানি তিনি সকলের বড়।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড় ॥
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি।
তবে সে হইবে মোর ব্যাসবারাণসী ॥
এত ভাবি ব্যাসদেব মনে কৈলা স্থির।
অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর ॥
বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ।
কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্যাসের তপস্তায় অন্নদার চাঞ্চল্য

গজানন ষড়ানন সঙ্গে করি পঞ্চানন
কৈলাসেতে করেন ভোজন।
অন্নপূর্ণা ভগবতী অন্ন দেন হৃষ্টমতি
ভোজন করিছে ভূতগণ ॥
ছয় মুখ কার্ত্তিকের গজমুখ গণেশের
মহেশের নিজে মুখপঞ্চ।

কত মুখ কত জন বেতাল ভৈরবগণ
ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ ॥
লেগেছে সিদ্ধির লাগি খেতে বড় অনুরাগী
যার মুখ তিন বাপে পুতে।
অন্নদার হস্ত দুটি অন্ন দেন গুটি গুটি
থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে ॥
অন্নদা বুঝিলা মনে কৌতুক আমার সনে
বুঝা যাবে কেবা কত খান।
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় পাতে পাতে অপ্রমেয়
পয়োনিধি পর্ব্বত প্রমাণ ॥
খাইবেন কেবা কত সবে হৈলা বুদ্ধিহত
অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও।
অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি কে রাখিবে করি বাসি
খেতে হবে খাও খাও খাও ॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা খেলারসে পরিপূর্ণা
নারীভাবে পতি পুত্র লয়ে।
ব্যাসের তপের গাছ অন্নদার লয়ে পাছ
ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে ॥
ব্যাস জপে অনশনে অন্নদা জানিলা মনে
ব্যাসের তপের অনুবলে।
কপালে টনক নড়ে হাতে হৈতে হাতা পড়ে
উছুট[1] লাগিয়া পদ টলে ॥
দুর্দ্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম্মে মন্দ করে
অন্নদার উপজিল রোষ।
অনুগ্রহ গেল নাশ নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস
ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ ॥

১। হোঁচট।

ভাবে বুঝি ক্রোধভর জিজ্ঞাসা করিলা হর
কেন দেবি দেখি ভাবান্তর।
অন্নদা কহেন হরে ব্যাস মুনি তপ করে
অনশন কৈল বহুতর ॥
তুমি ঠাঁই নাহি নিলে কাশী হৈতে খেদাইলে
তাহাতে হয়েছে অপমান।
করিতে দ্বিতীয় কাশী হইয়াছে অভিলাষী
সেই হেতু করে মোর ধ্যান ॥
হাসিয়া কহেন হর বুঝি তারে দিবা বর
মোরে মেনে[১] দয়া না ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমা বই
এক মুটা অন্ন মেনে দিও ॥
সক্রোধে কহেন শিবা কৌতুক করহ কিবা
কি হয় তাহার দেখ বসি।
এত বড় তার সাদ তোমা সনে করি বাদ
করিবেক ব্যাসবারাণসী ॥
তবে যে কহিবে মোর তপস্যা করিল ঘোর
কি দোষে হইব রুষ্ট তারে।
অসময় সুসময় না বুঝিয়া দুরাশয়
বিরক্ত করিল অত্যাচারে ॥
বলি রাজা ভগবানে ত্রিপাদ ধরণী দানে
অধোগতি পাইল যেমন।
তেমনি ব্যাসেরে গিয়া শাপ দিব বর দিয়া
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন ॥
মহামায়া মায়া করি জরতীশরীর ধরি
ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা।
অন্নপূর্ণাপদতলে ভারত বিনয়ে বলে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা ॥

১। অর্থহীন বাক্যালঙ্কার।

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনা

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে ॥
কত মায়া কর　　　কত কায়া ধর
হেরি হরি হর হারে।
জিতজরামর　　　হয় সেই নর
তুমি দয়া কর যারে ॥
এ ভব সংসারে　　　যে ভজে তোমারে
যম নাহি পারে তারে।
যদি না তারিবে　　　যদি না চাহিবে
ভারত ডাকিবে কারে ॥

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি ॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি[1]।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি[2] ॥
ডেঙ্গর[3] উকুন নীক[4] করে ইলিবিলি।
কুটকুটি কানকোটারির[5] কিলিবিলি ॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে ॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে ॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার ॥
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা[6] করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান ॥

১। শৃঙ্খলা ;　২। কেতকীফুলের মঞ্জরী ;　৩। ডাগর ; বড় ;
৪। ছোট উকুন ;　৫। একপ্রকার ছোট কীট ;　৬। ন্যাকড়া।

ফেলিয়া ঝুপড়ী লড়ি আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কান ঢেকে যায়।
কুঁজভরে পিঠডাঁড়া ভূমিতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই॥
কাশীতে মরিলে তাহে কত ভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে॥
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর।
সদ্য মুক্ত হবি যদি এইখানে মর॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া॥
তোর মনে আমি বুঝি এখন মরিব।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥
উদ্বেগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
জল বিনা অন্ন বিনা শুখায়েছে আঁত॥

বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শণনুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি ॥
শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুজে ॥
কানকোটারিতে মোর কান কৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ী বলে এ ত বড জ্বালা॥
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান।
আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান ॥
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের।
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের ॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া ॥
বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও।
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও ॥
বুডা বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ ॥
মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা কহিলে।
পুন কহ কি হইবে এখানে মরিলে ॥
ব্যাসদেব কন বুড়ী বুঝিতে নারিলে।
সন্ত মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে ॥
বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কালা।
কি বল বুঝিতে নারি এ ত বড় জ্বালা ॥
পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি।
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি ॥
ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা ॥
এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত ॥

দৈবদোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে ॥
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কানের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে ॥
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কান।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
বুড়ি না দেখিয়া ব্যাস আন্ধার দেখিলা।
হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা ॥
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু।
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু ॥
বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়।
মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায় ॥
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল ॥
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব ॥
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব ॥
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া ॥
ব্যাসবারাণসী হবে ভাবিলাম বসি।
বাক্যদোষে হইল গর্দ্দভবারাণসী ॥
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়।
ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয় ॥

ব্যাসের প্রতি দৈববাণী

ভুল না রে অরে নর শঙ্কর সার কর।
শমনেরে কেন ডর ॥
দূর হবে পাপ চূর হবে তাপ
গঙ্গাধরে ধ্যানে ধর।
শঙ্কর শঙ্কর এ তিন অক্ষর
মালা করি গলে পর ॥
এ ভব সাগরে না ভজিয়া হরে
কেন মিছা ডুবি মর।
ভারতের মত শুন রে ভকত
ভবে ভজি ভব তর ॥

বিরসবদন দেখি ব্যাস তপোধনে।
কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশবচনে ॥
শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ।
এ দুঃখ তোমাকে দিল শিবনিন্দা পাপ ॥
জ্ঞানঅহঙ্কারে বারাণসী মাঝে গিয়া।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিয়া ॥
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ হয়েছিল বটে।
শিবে স্তুতি করি পার পাইলা সঙ্কটে ॥
তার পর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে।
সেই দোষে কাশী মাঝে ভিক্ষা না পাইলে ॥
এক পাপে দুঃখ পেয়ে আরো কৈলা পাপ।
না বুঝিয়া কাশীবাসিগণে দিলা শাপ ॥
অন্ন বিনা শিষ্য সহ উপবাসী ছিলে।
আমি গিয়া অন্ন দিনু তেঁই সে বাঁচিলে ॥
মোর উপরোধে তোরে মহেশ ঠাকুর।
নষ্ট না করিয়া কৈলা কাশী হৈতে দূর ॥

আমি দিনু বর চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এইরূপে আমি তোরে বরদান দিয়া।
সে দিন রুদ্রের ক্রোধে দিনু বাঁচাইয়া॥
তথাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ।
কাশী করিবারে চাহ এ বড় দুর্ব্বোধ[1]॥
আমার দ্বিতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শূলীর।
যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর॥
ইতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল।
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল॥
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার।
নিগম আগম আদি কেবা জানে পার॥
অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
খুঁয়ে তাঁতি[2] হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥
করিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ।
অভিমান দূর করি চল নিজ বাস॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে।
এখানে মরিবে যেই গর্দ্দভ হইবে।
এই হৈল গর্দ্দভকাশী অন্যথা নহিবে॥
শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন।
উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন॥
কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া।
বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া॥

১। মন্দবুদ্ধি; ২। তিসিগাছের বাকলের সূতা হইতে যে বস্ত্রাদি তৈয়ার করে।

জয়া বিজয়ারে কন সহাসবদনে।
নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে॥
কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যত বাণী।
কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি॥
বসুন্ধর নামে তার আছে সহচর।
দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর॥
রমণীসম্ভোগ তার কাননে হইবে।
সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে॥
মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে।
ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে॥
তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার।
কুবেরের সুতে শাপ দিবা পুনর্ব্বার॥
ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে।
হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে॥
দিল্লী হৈতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার।
তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার॥
তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায়॥
তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড়।
হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড়॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
হরিহোড় প্রসঙ্গ শুনহ ইতঃপর॥

বসুন্ধরে অন্নদার শাপ

কুবেরের অনুচর নাম তার বসুন্ধর
বসুন্ধরা নামে তার জায়া।
দুই জনে হৃষ্টমনে ক্রীড়া করে কুঞ্জবনে
নানা রস জানে নানা মায়া॥

চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে অন্নদার পূজা দিতে
নানা দ্রব্য আনি শীঘ্রগতি।
ফুল আনিবার তরে ডাক দিয়া বসুন্ধরে
কুবের দিলেন অনুমতি॥
কুবেরের আজ্ঞা পায় বসুন্ধর বেগে ধায়
কুঞ্জবনে হৈল উপনীত।
নানা জাতি তুলে ফুল যাহে মত্ত অলিকুল
যার গন্ধে মদন মোহিত॥
দেখিয়া পুষ্পের শোভা বসুন্ধরা রতিলোভা
বসুন্ধরে কহিতে লাগিল।
ফুলগুণে ফুলবাণ ফুলধনু দিয়া টান
ফুলবাণে আমারে বিন্ধিল॥
আলিঙ্গন দিয়া কান্ত কামানল কর শান্ত
মোরে আর বিলম্ব না সহে।
কোকিলহুঙ্কার কাল ভ্রমর ঝঙ্কার শাল
মলয়পবনে তনু দহে॥
বসুন্ধর বলে প্রিয়া আগে আসি ফুল দিয়া
অন্নপূর্ণা পূজিবে কুবের।
পূজা সাঙ্গে তোমা সঙ্গে বিহার করিব রঙ্গে
এ সময় নাহি দিও ফের॥
অষ্টমীরে পর্ব্ব কয় ইথে রতি যুক্ত নয়
অন্নদার ব্রততিথি তায়।
আমার বচন ধর আজি রতি পরিহর
পূজা কর অন্নদার পায়॥
বসুন্ধরা বলে প্রভু এমন না শুনি কভু
এ কথা শিখিলা কার কাছে।
সাপে যারে কামড়ায় রোঝা গিয়া ঝাড়ে তায়
তাহে কি অষ্টমী আদি বাছে॥

কাম কাল বিষধর বিষে আমি জর জর
তুমি সে ঔষধ জান তার।
অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়ে অন্নদার নাম লয়ে
আরম্ভিলা কত ফের ফার ॥
অন্নপূর্ণা কি করিবে অষ্টমী কি সুখ দিবে
যে সুখ পাইবে রতিসুখে।
দেবাসুরে সুধা লাগি সিন্ধু মথি দুঃখভাগী
সে সুধা সঘনে পেও মুখে ॥
এই যে তুলিলা ফুল কে জানে ইহার মূল
বৃথা হবে জলে ভাসাইলে।
দেখ দেখি মহাশয় সম্ভোগে কি সুখ হয়
তোমায় আমায় গলে দিলে ॥
মালা গাঁথি এই ফুলে দিয়া দেখ মোর চুলে
মেঘে যেন বিজুলী খেলিবে।
বিপরীত রতি রঙ্গে পড়িলে তোমার অঙ্গে
ভাব দেখি কিবা শোভা দিবে ॥
এইরূপে বসুন্ধরে বিন্ধিয়া কটাক্ষ শরে
বসুন্ধরা মোহিত করিল।
কিবা করে ধ্যানে জ্ঞানে যে করে কামের বাণে
বসুন্ধর মদনে মাতিল ॥
সেই ফুলে শয্যা করি সেই ফুলে মালা পরি
রতি রসে দুজনে রহিল।
এথায় যক্ষের পতি অন্নদাপূজায় মতি
একমনে ধ্যান আরম্ভিল ॥
সংহত্তি বিজয়া জয়া কুবেরে করিয়া দয়া
অন্নদা করিলা অধিষ্ঠান।
দেখিয়া পুষ্পের ব্যাজ[১] কুবের যক্ষের রাজ
সভয় হইল কম্পমান ॥

১। বিলম্ব।

অন্নদা অন্তরে জানি কুবেরে নিকটে আনি
দয়ায় অভয়দান দিলা।
বসুন্ধরা বসুন্ধরে বান্ধি আনিবার তরে
ডাকিনী যোগিনী পাঠাইলা॥
ডাকিনী যোগিনীগণ প্রবেশিয়া কুঞ্জবন
বসুন্ধরা বসুন্ধরে ধরে।
সেই ফুলমালা সঙ্গে বুকে বুকে বান্ধি রঙ্গে
আনি দিল অন্নদা গোচরে॥
অন্নপূর্ণা ক্রোধমনে শাপ দিল দুই জনে
যেমন করিলি দুরাচার।
মরত ভুবনে যাও মনুষ্যশরীর পাও
ভারতের এই যুক্তি সার॥

বসুন্ধরের বিনয়

কান্দে বসুন্ধর বসুন্ধর।
অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ চরণের ছায়া
শাপে কৈলা জিয়ন্তেতে মরা॥
অজ্ঞানে করিনু দোষ ক্ষমা কর অভিরোষ[১]
তুমি দেবী জগতজননী।
ভস্ম না করিলে কেন কেন শাপ দিলে হেন
কোন সুখে যাইব ধরণী॥
অপরাধ অল্প মোর শাপ দিলা অতি ঘোর
নরলোকে কেমনে যাইব।
গর্ভবাস মহাদুখে ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুখে
মলমূত্রে ভূষিত থাকিব॥

১। ক্রোধ।

ভুঞ্জিব অশেষ ক্লেশ না পাব জ্ঞানের লেশ
পরদুঃখে[১] হইব দুঃখিত।
মহাপাপ থাকে যার গর্ভবাস হয় তার
নিগম আগমে সুবিদিত ॥
গর্ভবাস পাছে হয় ব্রহ্মাদিরো এই ভয়
সেই ভয়ে তোমারে সে ভজে।
ভব ঘোর পারাবারে তোমা বিনা কেবা পারে
যে তোমা না ভজে সেই মজে ॥
অপরাধ হইয়াছে আর কত শাস্তি আছে
কুম্ভীপাক রৌরব প্রভৃতি।
তাহে যেতে মন লয় মরতে যাইতে ভয়
বড় দুষ্ট নরের প্রকৃতি ॥
ক্রন্দনেতে দুহাঁকার দয়া হৈল অন্নদার
কহিলেন করিয়া সান্ত্বনা।
চল সুখে মর্ত্ত্যলোক না পাইবে রোগ শোক
না পাইবে গর্ভের যাতনা ॥
হয়ে মোর ব্রতদাস মোর পূজা পরকাশ
মরত ভুবনে গিয়া কর।
লোকে ব্রত পরকাশি পুন হবে স্বর্গবাসী
আমি সঙ্গে রব নিরন্তর ॥
শুনি বসুন্ধর কয় ইহা যদি সত্য হয়
তবে মোর মরতে কি ভয়।
তব অনুগ্রহ যথা কৈলাস কৌশল তথা
চতুর্ব্বর্গ সেইখানে হয় ॥
যদি সঙ্গে যাহ তুমি তবে আমি যাই ভূমি
এই বর দেহ দাঁড়াইয়া।

১। অশেষ দুঃখে ; চরম দুঃখে।

পাতালেতে গিয়া বলি ছিল যেন কুতূহলী
গোবিন্দেরে দুয়ারি পাইয়া ॥
এত বলি বসুন্ধর যোগাসনে করি ভর
জায়া সহ শরীর ত্যজিল।
অন্নপূর্ণা তুষ্ট হয়ে চলিলা দুজনে লয়ে
রায় গুণাকর বিরচিল ॥

বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম

বসুন্ধর বসুন্ধরা অন্নদার শাপে।
সমাধিতে দিয়া মন তনু ত্যজে তাপে ॥
বসুন্ধব বসুন্ধরা বসুন্ধরা চলে।
আগে আগে অন্নপূর্ণা যান কুতূহলে ॥
কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার।
কর্ম্মহেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার ॥
সপ্ত দ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ ॥
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান ॥
বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান।
তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান ॥
পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী।
সেই গ্রামে উত্তরিলা অন্নদা তারিণী ॥
জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া।
এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া ॥
তার ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর।
বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর ॥

হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম্ম সার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।
মুখগন্ধে পদ্মিনীর সদা উড়ে মাছি॥
তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া।
হের আস বলি তারে ডাক দিল জয়া॥
অভিমানে সেই রামা কারেহ না চায়।
মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায়॥
নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহাবে।
হের এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে॥
শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন।
কে ডাকিলে অভাগীরে কে আছে এমন॥
পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী॥
ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে।
যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে॥
মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।
কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড়॥
বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে॥
এমন দুখিনী আমি আমারে কে ডাকে।
সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে॥
যে বল সে বল আমি যাব নাহি কাছে।
অভাগীর ঠাঁই বল কিবা কার্য্য আছে॥

বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা।
কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা॥
আমার আশিষে তুমি পুত্রবতী হবে।
সেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখে রবে॥
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর।
কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যা বর॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে তুষিও পূজায়।
হইবেক নাম ডাক রাজায় প্রজায়॥
মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে।
বীজরূপে বসুন্ধরে রাখিলা তাহাতে॥
কানে কানে কহিলেন যতনে রাখিবে॥
ঋতুস্নান দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে॥
এতেক বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান।
দেখিতে না পেয়ে রামা হৈল হতজ্ঞান॥
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে লাগিলা কান্দিতে।
হায় রে দারুণ বিধি নারিনু চিনিতে॥
পেয়েছিনু মাণিক আঁচলে না বান্ধিনু।
নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু॥
কেমন দেবতা মেনে দেখা দিয়াছিলা।
অভাগীর ভাগ্যদোষে পুন লুকাইলা॥
হরিষ বিষাদে রামা গেল নিজালয়।
দেবীর দয়ায় ঋতু সেই দিনে হয়॥
স্নানদিনে সেই ফুল বাটিয়া খাইল।
পতিসঙ্গে রতিরঙ্গে গর্ব্ভিণী হইল॥
শুভ ক্ষণে বসুন্ধর কৈল গর্ভ..স।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥
গর্ভবেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা।
ক্রমে হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা॥

পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাহি ঠাঁই।
ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই॥
আপনি দিলেন হুলু নাড়ীচ্ছেদ করি।
দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত

অন্নদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম লয়ে
বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষ্ণুহোড় পায় সুখ
পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল॥
ষষ্ঠীপূজা হৈল সায় ছয় মাসে অন্ন খায়
যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে।
বনে মাঠে বেড়াইয়া কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া
বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে॥
এক দিন শূন্য পথে অন্নপূর্ণা সিংহরথে
কুতূহলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
জয়া বিজয়ার সঙ্গে কথোপকথনরঙ্গে
হরিহোড়ে পাইলা দেখিতে॥
মনে হৈল পূর্ব্বকথা আপনি আসিয়া তথা
মায়া করি হইলেন বুড়ী।
কাট খড় জড়াইয়া সব ঘুঁটে কুড়াইয়া
রাখিলেন ভরি এক ঝুড়ি॥
হরিহোড় যেথা যান কাট ঘুঁটে নাহি পান
আট দিক আন্ধার দেখিলা।
বিস্তর রোদন করি হরি হরি স্মরে হরি
বুড়ীটিরে দেখিতে পাইলা॥

দেখেন বুড়ীর কাছে ঝুড়িভরা ঘুঁটে আছে
বোঝাবান্ধা কাট আছে তায়।
হরিহোড় কান্দি কহে বুড়ী মজাইল দহে
আজি বড় দেখি অনুপায় ॥
কোথা হৈতে আসি বুড়ী ঘুঁটে লয়ে ভরে ঝুড়ি
সর্ব্বনাশ করিল আমার।
কাড়ি নিলে হবে পাপ বুড়ী পাছে দেয় শাপ
এ দুঃখের নাহি দেখি পার ॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে আকুল অন্নের তরে
ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল।
কিছু ঘুঁটে না পাইনু মিছা বেলা মজাইনু
এ ছার জীবনে কিবা ফল ॥
দয়া করি হরপ্রিয়া হরিহোড়ে ডাক দিয়া
ছল করি লাগিলা কহিতে।
কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া রাখিয়াছি সাজাইয়া
অরে বাছা না পারি বহিতে ॥
মঙ্গল হইবে তোর অতিদূরে ঘর মোর
ঘুঁটেগুলি যদি দেহ বয়ে।
অর্দ্ধেক আমার হবে অর্দ্ধেক আপনি লবে
দয়া করি চল মোরে লয়ে ॥
হরিহোড় এত শুনি অর্দ্ধ লাভ মনে গুণি
মাথায় লইলা ঘুঁটেঝুড়ি।
বাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকে লড়ী[1] ধরে থেকে থেকে
আগে আগে চলিলেন বুড়ী ॥
নিকটে হরির ঘর নহে অতি দূরতর
সাঁঝ কৈলা সেইখানে যেতে।

১। লাঠি।

তাহারি উঠানে গিয়া বসিলেন হরপ্রিয়া
কহেন চলিতে নারি রেতে ॥
কহিলা মধুর স্বরে থাকিলাম তোর ঘরে
হরি বলে এ হবে কেমনে।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে ॥
অতিথি আপনি হবে উপোসী কেমনে রবে
অন্নের সংযোগ মোর নাই।
হেন ভাগ্য নাহি ধরি অতিথি সেবন করি
এই বেলা দেখ আর ঠাঁই ॥
এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।
গেল চারিপর[১] দিন অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ
যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে ॥
হরির শুনিয়া বাণী কহেন হরের রাণী
অরে বাছা না ভাবিহ দুখ।
ভারত সান্ত্বনা করে অন্নদা আইলা ঘরে
ইতঃপর পাবে যত সুখ ॥

হরিহোড়ে অন্নদার দয়া

ভবানী বাণী বল এক বার।
ভবানী ভবের সার ॥
ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী
ভবনদী করে পার।
ভবানী ভাবিয়া ভবানী পাইয়া
ভব তরে ভবভার ॥

১। চারি প্রহর।

ভবানী যে বলে এ ভবমণ্ডলে
ভবনে ভবানী তার।
ভবানীনন্দন ভারত ব্রাহ্মণ
ভবানী ভরসা যার॥

হাসিয়া কহেন দেবী শুন রে বাছনি।
না জানে গৃহিণীপনা তোমার জননী॥
গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে।
সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে।
প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয়।
ইহলোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয়॥
অন্নে পূর্ণা ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায়।
অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায়॥
শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী।
অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি॥
বুড়ীটি কহেন রামা শুন মন দিয়া।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া॥
হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥
শুনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল॥
হাঁড়ী পাড়ি দেখে অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি।
দণ্ডবত প্রণাম বুড়ীরে করে আসি॥
হরিহোড় বলে তুমি কে বট আপনি।
পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরণী॥
বুড়ীটি কহেন বাছা আগে অন্ন খাও।
শেষে দিব পরিচয় আর যাহা চাও॥

হরি বলে পিতা মাতা আগে খান ভাত।
পরিচয় দিলে অন্ন খাইব পশ্চাত ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হৈল তোমারে দেখিয়া।
দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া ॥
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা হরি।
পরিচয় দিব আগে দুঃখ দূর করি ॥
আহা মরি ঘুঁটে বেচি তোমার নির্ব্বাহ।
এই ঘুঁটে একখানি বেচিবারে যাহ ॥
এত বলি একখানি ঘুঁটে হাতে লয়ে।
দিলেন হবির হাতে অনুকূল হয়ে ॥
ঘুঁটে হৈল হেমঘুঁটে দেবীর পরশে।
লোহা যেন হেম হয় পরশি পরশে ॥
ঘুঁটে দেখি হেমঘুঁটে হরিহোড়ে ভয়।
এ কি দেখি অপরূপ ঘুঁটে সোনা হয় ॥
কেমন দেবতা মেনে বুড়ী ঠাকুরাণী।
জাগিতে স্বপন কিবা বাজি অনুমানি ॥
তপস্যা কি আছে যে দেবতা দেখা দিবে।
ভাগ্যগুণে বুঝি কোন বিপদ ঘটিবে ॥
হেমঘুঁটে হাতে হরি কাঁপে থর থর।
অনিমিক নয়নে সলিল ঝর ঝর ॥
এইরূপে হরিহোড়ে মোহিত দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ হাসিয়া ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

হরিহোড়ে বরদান

ভয় কি রে অরে বাছা হরি।
আমি অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী॥

অরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয়।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়॥
দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।
ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর।
চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥
আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।
মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে॥
দেবীর অমৃতবাক্যে পাইয়া আনন্দ।
প্রণমিয়া হরিহোড় কহে মৃদু মন্দ॥
অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা অধমের ঘরে।
কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে॥
বিধি বিষ্ণু বিরিঞ্চি বাসব আদি দেবে।
দেখিতে না পায় যাঁরে ধ্যান করি সেবে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁর নামে হয়।
তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয়॥
শুনিয়াছি কাশীতে তাঁহার অধিষ্ঠান।
সেই মূর্ত্তি দেখি যদি তবে সে প্রমাণ॥
নহে হেন অসম্ভবে কে করে প্রত্যয়।
ভেলকীতে কত ভাত ঘুঁটে সোনা হয়॥
হাসিয়া কহেন দেবী দেখ রে চাহিয়া।
বসিলেন অন্নপূর্ণা মূরতি ধরিয়া॥
মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়ে।
দুই হাতে পানপাত্র রত্নহাতা লয়ে॥

কোটি শশী জিনি মুখ অর্দ্ধ শশী ভালে।
শিরে রত্নমুকুট কবরী কেশজালে॥
পঞ্চমুখ সম্মুখে নাচেন অন্ন খেয়ে।
ভূমে পড়ে হরিহোড় একবার চেয়ে॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া হরিহোড়ে হরপ্রিয়া।
প্রবোধিয়া দিলা বর রূপ সম্বরিয়া॥
হরিহোড় বলে মা গো ধনে কাজ কিবা।
এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা॥
হাসিয়া কহিলা দেবী সে ত হবে শেষে।
কিছু দিন সুখভোগ করহ বিশেষে॥
হরিহোড় কহে মা গো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে॥
তবে লব ধন আগে দেহ এই বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥
কিঞ্চিত ভাবিয়া দেবী তথাস্তু বলিলা।
ভোজন করিতে পুনর্ব্বার আজ্ঞা দিলা॥
দেবীর আজ্ঞায় হরিহোড় ভাগ্যধর।
মায়েরে কহিলা অন্ন দেহ শীঘ্রতর॥
পদ্মিনী পদ্মিনী হৈল দেবীর দয়ায়।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুশোভিত কায়॥
মুখপদ্মগন্ধে মত্ত মধুকর ওড়ে।
মহানন্দে অন্ন বাড়ি দিলা হরিহোড়ে॥
চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস।
ভোজন করিল হরিহোড় মহাযশ।
বস্ত্র অলঙ্কারে বিষ্ণুহোড় দিব্যকায়।
কুটীর হইল কোঠা দেবীর কৃপায়॥

এইরূপে হরিহোড়ে দিয়া ধন বর।
অন্তরীক্ষে অন্নপূর্ণা গেলেন সত্বর॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

বসুন্ধরার জন্ম

এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর।
ধনধান্যে পরিপূর্ণ কুবেরসোঁসর॥
কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।
নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল॥
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।
বাহান্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্যকুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥
পিতা মাতা সুত ভ্রাতা কন্যা বধূগণ।
জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া।
রাখিলেক কিছুদিন অচলা করিয়া॥
ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন॥
শাপ দিতে হইবেক কুবেরনন্দনে।
জনম লইবে সেই মরতভুবনে॥
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম॥
ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়।
কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায়॥

হেন কালে বসুন্ধরা অব্যাহতরূপে।
কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোককূপে॥
আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া।
আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া॥
স্বামিহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া॥
আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥
শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী।
ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি॥
পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে।
অন্তরযামিনী তুমি তবু নাহি সুঝে॥
ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।
তবে কেন স্ত্রীপুরুষে কৈলা রতিসৃষ্টি॥
ব্রহ্মরূপা তুমি তেঁই নাহি পাপ পুণ্য।
হৌক মেনে জানা গেল বিবেচনাশূন্য॥
এইরূপে বসুন্ধরা গর্ব্বিত ভৎর্সনে।
কান্দিয়া কহিছে দেবী হাসিছেন মনে॥
জয়া বলে এই ভাল হইল উপায়।
ইহারে মানুষী করি বিভা দেহ তায়॥
ইহার কন্দলে তার অলক্ষণ হবে।
তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে॥
যুক্তি বটে বলি দেবী করিলেন ত্বরা।
বসুন্ধরা লইয়া চলিলা বসুন্ধরা॥
আন্দনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ু দত্ত।
তার বংশে ঝড়ু দত্ত ঠক মহামত্ত॥

ধূমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া।
তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া॥
শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ।
এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ॥
মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া।
সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া॥
ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে।
বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈলা তারে॥
শুভ ক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈল আসি।
লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী॥
বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া।
আজ্ঞাবহ সোহাগীব সোহাগ করিয়া॥
অন্নপূর্ণা ছাড়িতে সর্ব্বদা চান ছল।
চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল॥
ঝড়ু করে ঠকামি সোহাগী দ্বন্দ্ব করে।
নানা মতে ধন যায় রাজা ছল ধরে॥
কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার।
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥
সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে।
যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে॥
দিনে দিনে হরিহোড় পাইছে যন্ত্রণা।
কৈলাসে বসিয়া দেবী করেন মন্ত্রণা॥
ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল।
ভবানন্দ মজুন্দার যেমতে জন্মিল॥
কর গো করুণাময়ি করুণা কাতরে।
কৃপাকল্পতরু বিনা কেবা কৃপা করে।
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

নলকুবরে শাপ

কুবেরের সুত রূপ গুণযুত
বিখ্যাত নলকূবর।
তাহার কামিনী চন্দ্রিণী পদ্মিনী
দুঁহে প্রেম অতিতর[১] ॥
চৈত্র মধু মাস বসন্ত প্রকাশ
তরু লতা সুশোভিত।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
সৌরভে বিশ্ব মোহিত ॥
কুঞ্জবনে গিয়া রমণী লইয়া
বিহরে নলকূবর।
রমণী সঙ্গেতে বিহরে রঙ্গেতে
আর যত সহচর ॥
শুক্ল অষ্টমীতে ভুবন ভ্রমিতে
পূজা লইবার মনে।
অন্নদা জননী চলিলা আপনি
লয়ে সহচরীগণে ॥
যাইতে যাইতে পাইলা দেখিতে
নলকূবরের খেলা।
দেখি বনশোভা মন হৈল লোভা
কৌতুক দেখিতে গেলা ॥
নৃত্য বাদ্য গীত গন্ধে আমোদিত
নানা ভোজ্য আয়োজন।
নির্ম্মল চন্দ্রিকা প্রফুল্ল মল্লিকা
শীতল মন্দ পবন ॥

১। অতিশয়।

কহেন অভয়া দেখ লো বিজয়া
কে বুঝি পূজে আমারে।
এ কৈল যেমন না দেখি এমন
এই সে ধন্য সংসারে ॥
হাসি জয়া কহে ও মা এ সে নহে
এ ত কুবেরের বেটা ॥
পূজা কি কে জানে কারে বা ও মানে
উহারে আঁটয়ে কেটা ॥
ধনমত্ত অতি লইয়া যুবতী
ও করে কামবিহার।
পূজিবে তোমারে বল কি বিচারে
কি কব আমি ইহার ॥
ধনমত্ত যেই সে কি সেবা দেই
আপনি না জান কিবা ॥
নিকট হইয়া জিজ্ঞাসহ গিয়া
এখনি মর্ম্ম পাইবা ॥
পুরুষ আকারে যাহ ছলিবারে
না যেও নারীর বেশে।
মত্ত মধুপানে বিদ্ধ কামবাণে
লজ্জা দেই পাছে শেষে ॥
শুম্ভনিশুম্ভারে বধ করিবারে
মোহিনী হইয়াছিলে।
গৃহিণী করিতে আইল লইতে
মো সবারে লাজ দিলে ॥
জয়ার বচনে হাসি মনে মনে
আপনি দেবী চলিলা।
ব্রাহ্মণের বেশে কৌতুক অশেষে
নিকটেতে উত্তরিলা ॥

কহেন ব্রাহ্মণ শুন হে সুজন
কেমন বুদ্ধি তোমার।
পণ্ডিত হইয়া পর্ব্ব না মানিয়া
করিছ রতিবিহার॥
এই যে অষ্টমী পুণ্যদা এ তমী[১]
অন্নদার ব্রততিথি।
ইহাতে অন্নদা অবশ্য বরদা
তাঁহারে কর অতিথি॥
এই দিব্য স্থল এ দ্রব্য সকল
অন্নদাপূজার যোগ্য।
না পূজি তাঁহারে যুবতীবিহারে
কেন কর প্রেতভোগ্য॥
এমন শুনিয়া হাসিয়া ঢুলিয়া
ঘূর্ণিত রক্ত লোচনে।
মাথা হেলাইয়া অঙ্গ দোলাইয়া
জড়িমযুক্ত বচনে॥
অতিমত্ত মদে না গণে আপদে
কহে কুবেরের বেটা।
এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা॥
এ সুখযামিনী এ নব কামিনী
এ আমি নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক॥
জানি অন্নদারে সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।

১। রাত্রি।

অন্নদা যেমন কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে ॥
শঙ্কর ভিখারী সে ত তারি নারী
আমি মর্ম্ম জানি তার।
বাপার ভাণ্ডাবে অন্ন চাহিবারে
দিনে আসে তিন বার ॥
কি বলে বামণ অরে চরগণ
বধ রে ইহার প্রাণ।
এমন শুনিয়া সক্রোধ হইয়া
দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
হুকার ছাড়িয়া জয়ারে ডাকিয়া
বিজয়ারে দিলা পান।
ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী
যুদ্ধে হৈল আগুয়ান ॥
ভাঙ্গি কুঞ্জবনে বধি যক্ষগণে
নলকূবরেবে ধরে।
রমণী সঙ্গেতে বান্ধিয়া রঙ্গেতে
দিল অন্নদা গোচবে ॥
অন্নদা ভাবিয়া ব্রতের লাগিয়া
শাপ দিলা তিন জনে।
মর্ত্ত্যলোকে যাও নরদেহ পাও
রায় গুণাকর ভণে ॥

নলকুবরের প্রাণত্যাগ

কান্দে নলকূবর দুঃখিত।
চন্দ্রিণী পদ্মিনী সংমিলিত ॥
না জানিয়া করিয়াছি দোষ।
দয়াময়ি দূর কর রোষ ॥
কেন দিলা নিদারুণ শাপ।
ভূমে গেলে বাড়িবেক তাপ ॥
শাস্তি দিবা যদি মনে আছে।
সুঁপে দেহ শমনের কাছে ॥
কুম্ভীপাক রৌরবে রহিব।
তথাপি ভূতলে না যাইব ॥
ভূমে কলি বড় বলবান্।
নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান ॥
পাতকী লোকের মাঝে গিয়া।
পড়ি রব পাপ বাড়াইয়া ॥
ক্রন্দনে দেবীর হৈল দয়া।
মর্ম্ম বুঝি কহিছে বিজয়া ॥
ভয় নাহি ও নলকূবর।
চল তুমি অবনী ভিতর ॥
অন্নদার হবে ব্রতদাস[১]।
ব্রতকথা করিবে প্রকাশ ॥
পুনরপি এখানে আসিবে।
কলি তোমা ছুঁতে না পারিবে ॥
অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা রঙ্গে।
আপনি যাবেন তোমা সঙ্গে ॥

১। ভক্ত।

কান্দি কহে কুবেরের বেটা।
এ বাক্যে প্রত্যয় করে কেটা॥
অধম নরের ঘরে যাব।
কোন্ গুণে অন্নদারে পাব॥
ব্যস্ত হব উদর ভরণে।
কি জানিব ভজন পূজনে॥
সন্তান কেমন মেনে হবে।
তাহে কি দেবীর দয়া রবে॥
অন্নপূর্ণা কহেন আপনি।
ভয় নাহি চল রে অবনী॥
জনামবে ব্রাহ্মণের ঘরে।
মোরে ভক্তি রহিবে অন্তরে॥
আপনি তোমাব ঘরে যাব।
বড় বড় সঙ্কটে বাঁচাবো॥
তোমার সন্তানে রাজা হবে।
তাহাতে আমার দয়া রবে॥
এত শুনি কুবেরনন্দন।
জায়া সহ ত্যজিল জীবন॥
অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে।
অবনী চলিলা হৃষ্টা হয়ে॥
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।
রচিল ভারতচন্দ্র রায়॥

ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত

অভয়া দয়া কর আমারে গো।
বিপকে ডাকিতোমারে গো॥

দানবদমনী শমনশমনী
ভবানী ভবসংসারে গো।
সঙ্কটতারিণী লজ্জানিবারণী
তোমা বিনা কব কারে গো॥
জঠরযন্ত্রণা যমের মন্ত্রণা
কত সব বারে বারে গো।
দয়াদৃষ্টে চাহ ত্বরায় তরাহ
ভারতেরে ভবভারে গো॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে।
উত্তরিলা ধরাতলে মহাহৃষ্টা হয়ে॥
ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম।
গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।
যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম।
রহিতে বাসনা নাহি হরিহোড় ধামে।
এই হেতু উত্তরিলা আন্দুলিয়া গ্রামে॥
তাহে রাম সমদ্দার নাম এক জন।
শ্রোত্রিয় কেশরী গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ॥
সীতা ঠাকুরাণী নামে তাহার গৃহিণী।
ঋতুস্নান সে দিন করিয়াছিলা তিনি॥
রতিরসে সেই সতী পতিরে তুষিলা।
নলকূবরেরে দেবী সেই গর্ভে দিলা॥
শুভ ক্ষণে নলকূবরের গর্ভবাস।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥
ভূমিষ্ঠ হইল নলকূবর স্বচ্ছন্দে।
ভবানন্দ নাম হৈল ভূপের আনন্দে॥

লালন পালন পাঠ ক্রমে সাঙ্গ পায়।
বিস্তার বর্ণিতে তার পুথি বেড়ে যায় ॥
চন্দ্রিণী পদ্মিনী দুহে কত দিন পরে।
জনম লইল দুই ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দু জনার।
বিবাহ করিলা ভবানন্দ মজুমদার[১] ॥
চন্দ্রমুখী প্রসবিলা তিন পুত্র ক্রমে।
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ॥
পদ্মমুখী যুবতী রহিলা অই মত।
স্বয়াভাবে মজুন্দার তাহে অনুগত ॥
নানা রসে মজুন্দার দুহে অভিলাষী।
সাধী মাধী নামে দুঁহে দিলা দুই দাসী ॥
ইতঃপর অন্নপূর্ণা হরিহোড়ে ছাড়ি।
আসিবেন ভবানন্দ মজুন্দার বাড়ী ॥
গৃহচ্ছেদে হরিহোড় সতত উন্মনা।
দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা ॥
এক দিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে ॥
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে ॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে ॥
ওই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে ॥
স্থির নাহি হয় হরি যত ধ্যান ধরে।
বাহিরে আসিয়া দেখে কন্যা আছে ঘরে ॥

১। মজুন্দার—রাজ্যের হিসাব লেখক।

জিজ্ঞাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল।
অন্নদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল॥
চারি দিকে বন্ধুগণ করে হায় হায়।
দেখিতে দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায়॥
সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে।
স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়ে॥
অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর তীরে উপনীত।
রচিল ভারতচন্দ্র অন্নদার গীত॥

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা

কে জানিবে তারানামমহিমা গো।
ভীম ভজে নাম ভীমা গো॥
আগম নিগমে পুরাণ নিয়মে
শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ধাম নাম
শিবের সেই সে অণিমা গো॥
নিলে তারা নাম তরে পরিণাম
নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর কহে নিরন্তর
কি কর কৃপাময়ী মা গো॥

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার[১] ॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত[২]।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত[৩] ॥
পিতামহ[৪] দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম[৫] ॥
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ[৬]।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন[৭] ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ[৮]।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ[৯] ॥

১। অদল-বদল ; উল্টা-পাল্টা ; অর্থাৎ আবার ফিরাইয়া আনিতে বলা।
২। কুলীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুখোপাধ্যায় বংশ ; আবার পর্বতশ্রেণীর মধ্যে হিমালয় পর্বত শ্রেষ্ঠ, অন্নপূর্ণা তাঁহার কন্যা।
৩। নবধাকুললক্ষণম ; যিনি নয়টি শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী তিনি কুলীন। মহাদেব ঐ সকল গুণের অধিকারী, বন্দনীয় বংশে তাঁহার জন্ম। আবার বন্দ্যোপাধ্যায়রা বিশিষ্ট কুলীন।
৪। ব্রহ্মা।
৫। শিব অনেকের পতি—যেমন ভূতনাথ, কৈলাসনাথ ইত্যাদি। তিনি বামাচারী তান্ত্রিক। পাটুনী মনে করিল অন্নপূর্ণার স্বামী কুলীন, তিনি বহু বিবাহ করিয়াছেন। তাই তিনি অন্নপূর্ণার উপর বাম অর্থাৎ অসন্তুষ্ট।
৬। মহাদেব হইতেছেন আদি দেব, তাঁহার পূর্বে কোন দেবতা নাই, তাই তিনি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ। মহাদেব সিদ্ধ যোগীপুরুষ। পাটুনী মনে করিল অন্নপূর্ণার স্বামী বুড়া, গাঁজা-ভাঙ খান।
৭। মহাদেবের কোন্ গুণ নাই অর্থাৎ তাঁহার সর্ব গুণ আছে। তাঁহার কপালে অগ্নি জ্বলে অর্থাৎ তাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়। পাটুনী মনে করিল অন্নপূর্ণার স্বামীর কোন গুণ নাই তাই তিনি অদৃষ্টকে ধিকার দিতেছেন।
৮। মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে বেদের কথা আলোচনা করেন। মহাদেবের কণ্ঠে বিষ রহিয়াছে যাহা তিনি সমুদ্র মন্থনের সময় পান করিয়া দেবতা ও অসুরকে বাঁচাইয়াছিলেন। পাটুনী মনে করিল অন্নপূর্ণার স্বামী সব সময় কটু কথা বলেন, তাঁহার কথা খুবই রূক্ষ অর্থাৎ যেন বিষ মাখা।
৯। হর-পার্বতী দিবারাত্র মিলিত থাকেন। পাটুনী মনে করিল অন্নপূর্ণার স্বামী তাঁহার সঙ্গে সর্বদা ঝগড়া করেন।

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি[১]।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি[২] ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে[৩]।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে[৪] ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই[৫]।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল ॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ॥
যার নামে পাব কবে ভবপারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহাবে করে পার ॥
বসিলা নায়ের বাড়ে[৬] নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥
পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ॥

১-২। মহাদেবের জটায় গঙ্গা অধিষ্ঠান করেন। তিনি মহাদেবের খুবই প্রিয়। পাটুনী মনে করিল যে, অন্নপূর্ণার গঙ্গা নামে এক সতীন আছে। স্বামী এই সতীনকেই বেশী ভালবাসেন।

৩। মহাদেবের অপর নাম ভূতনাথ বা প্রমথেশ। ভূতপ্রেত তাঁহার সঙ্গী। পাটুনী মনে করিল যে, অন্নপূর্ণার স্বামী বাজে সঙ্গী সাথী নিয়া ঘুরিয়া বেড়ান।

৪। অন্নপূর্ণার পিতা গিরিরাজ হিমালয়। পাটুনী মনে করিল যে, অন্নপূর্ণার নির্দয় পিতা এইরূপ স্বামীর হাতে তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন।

৫। পর্বতের পূর্বে ডানা ছিল। তাহারা ইচ্ছামত উড়িতে পারিত। কিন্তু উড়িয়া গিয়া যেখানে তাহারা বসিত সেখানকার প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইত। ইন্দ্র তাই পর্বতদের পাখা কাটিয়া দিয়াছিলেন। হিমালয়ের পুত্র মৈনাক ইন্দ্রের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। পাটুনী মনে করিল, বোনের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অন্নপূর্ণার ভাই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল।

৬। বাহিরে।

ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল ॥
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে ॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায় ॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে ॥
সোনার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥
তীরে উত্তরিলা তরি তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা ॥
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি ॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টাপদ[১] ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥

১ সোনা।

যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে ॥
কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তাব বাড়ী কন্দলের ত্রাসে ॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বব মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমাব সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা ববদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বাব ফিবে চাহে দেখিতে না পায় ॥
সার্ত্তপাঁচ-মনে করি প্রেমেতে পূরিল।
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল ॥
তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয়।
সোনার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয় ॥
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি।
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি ॥
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান ॥
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা ॥
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে ॥

আকাশ বাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবত হৈলা ভবানন্দ মজুন্দার ॥
অন্নপূর্ণাপূজা কৈলা কত কব তার।
নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার ॥
করুণাকটাক্ষ চয়[১] উত্তর উত্তর।
সংক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর ॥
ইতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর।
প্রতাপআদিত্য মানসিংহের সমর ॥

১। সমূহ।

সমাপ্ত